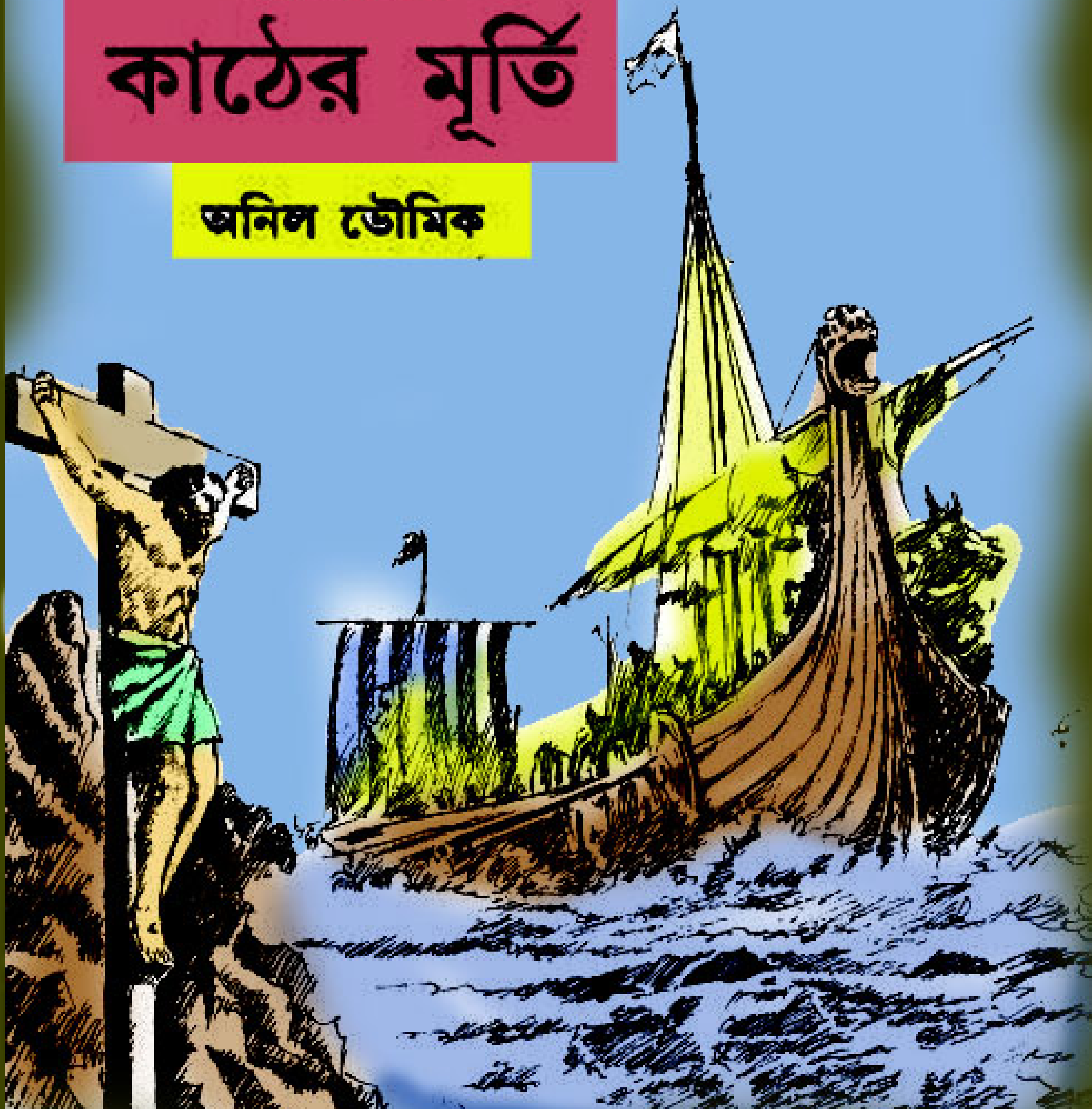
ফ্রান্সিসের নতুন অভিযান

যীশুর কাঠের মূর্তি

অনিল ভৌমিক



প্রথম প্রকাশ

শারদীয়া শুকতারা

আশ্বিন ১৪০২ ✱ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

কর্সিকার দ্বীপের বোনিফেসিও বন্দর থেকে এবার ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে দেশে ফেরার জন্য বারবার বলতে লাগল। দেশ ছেড়ে এসেছে অনেকদিন। ওরা প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু ফ্রান্সিসকে রাজী করাতে না পারলে কিছুই হবে না। বন্ধুরা মারিয়াকেও বারবার অনুরোধ করতে লাগল, রাজকুমারী—আপনি ফ্রান্সিসকে রাজী করান।

মারিয়ার নিজেরও এইসব বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকতে মন চাইছিল না। তবু সাবধানে কথাটা পাড়ল। ফ্রান্সিসকে বলল, এবার দেশেই ফিরে চলো। পরে আবার না হয় সমুদ্রযাত্রায় বেরুনো যাবে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, মারিয়া, দেশের টান সকলেরই থাকে। আমারও আছে। কিন্তু দেশে ফিরে ঐ যে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন—এ আমার ভালো লাগে না। তবু তোমাদের বিশেষ করে তোমার অনুরোধে দেশের দিকে জাহাজ চালাতেই বলছি ফ্লাইজারকে। কিন্তু আবার যদি কোনো রহস্যের সন্ধান পাই তবে আবার লেগে পড়বো।

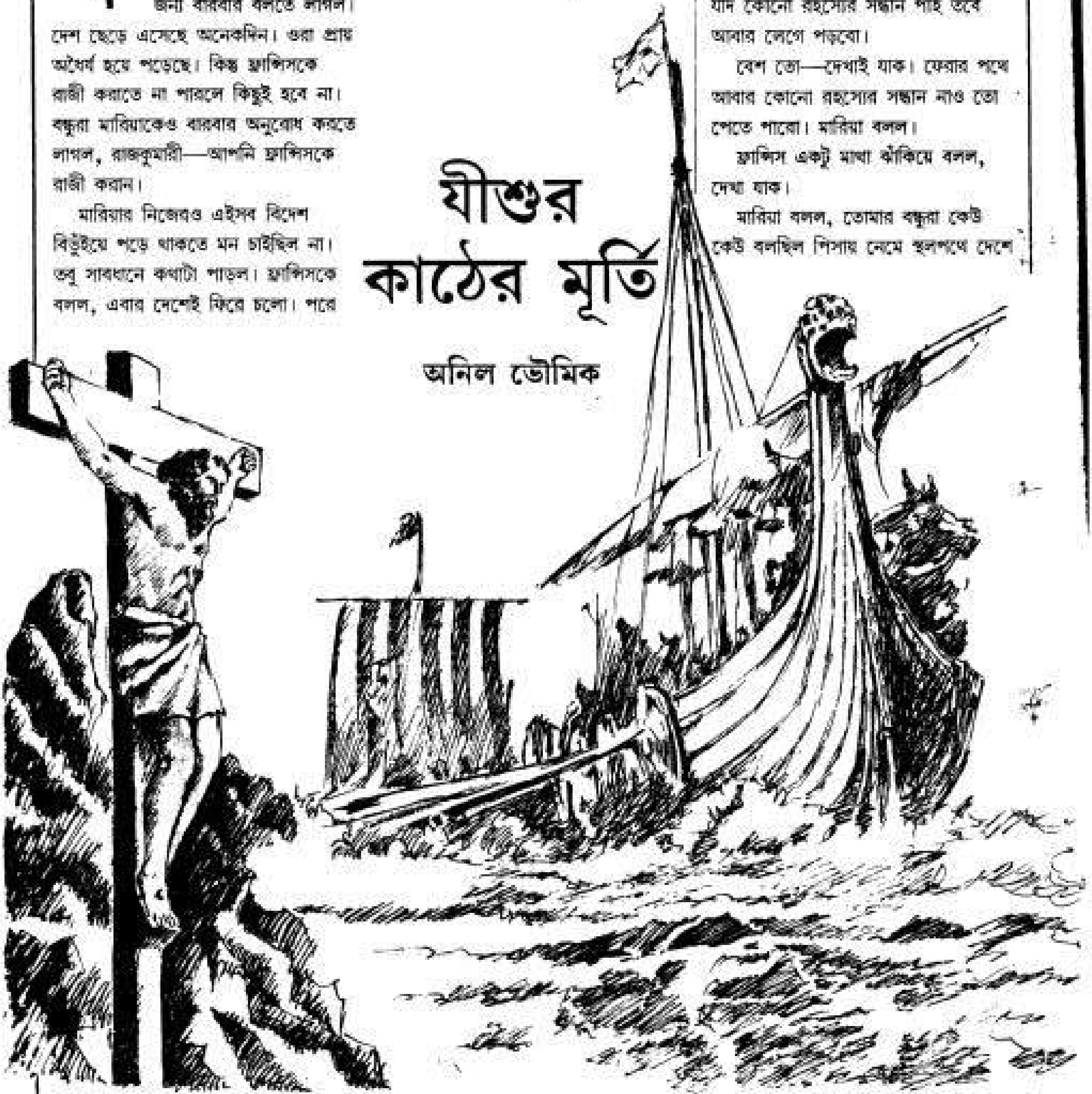
বেশ তো—দেখাই যাক। ফেরার পথে আবার কোনো রহস্যের সন্ধান পাও তো পেতে পারো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দেখা যাক।

মারিয়া বলল, তোমার বন্ধুরা কেউ কেউ বলছিল পিসায় নেমে স্থলপথে দেশে

যীশুর কাঠের মূর্তি

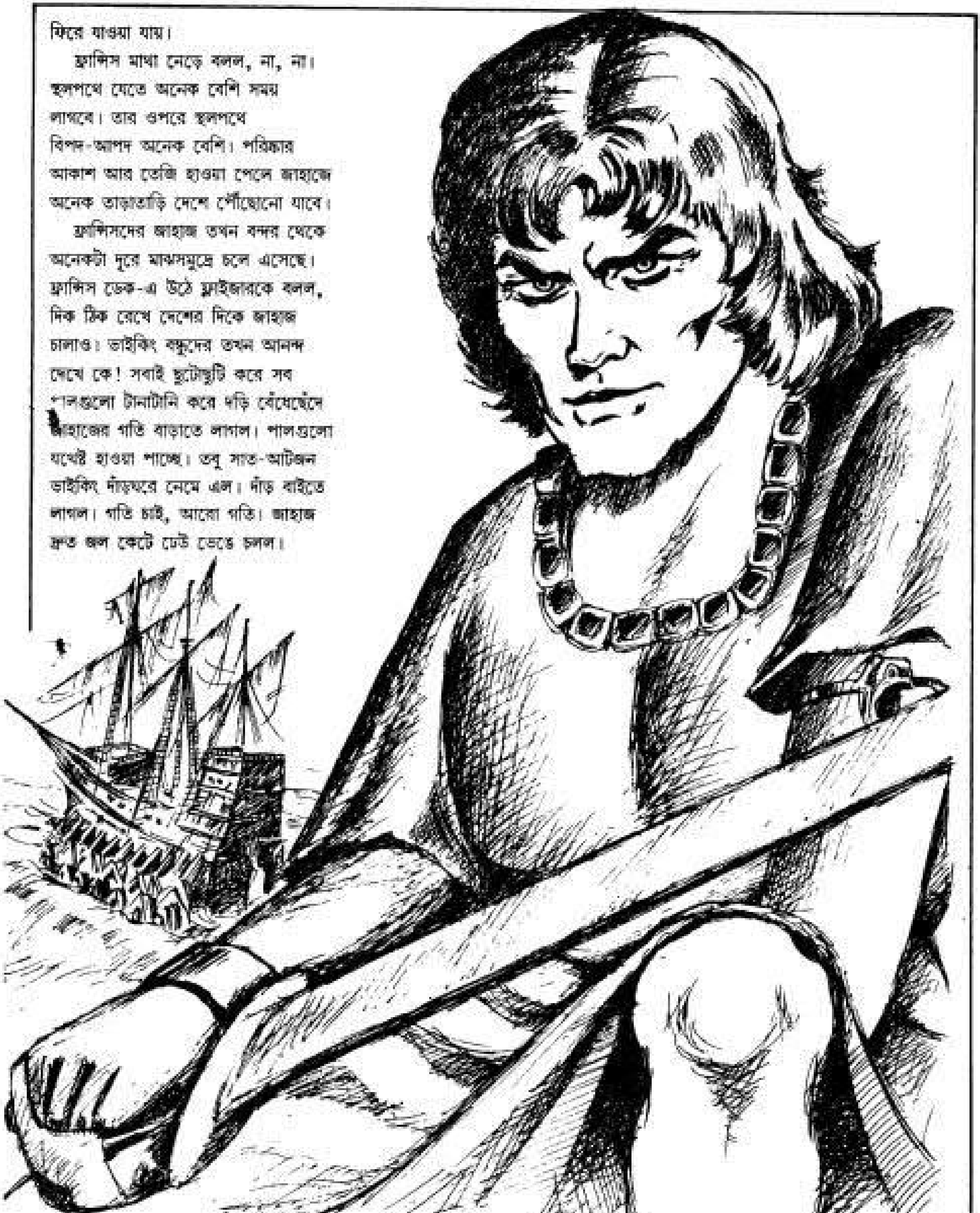
অনিল ভৌমিক



ফিরে যাওয়া যায়।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, না, না। স্থলপথে যেতে অনেক বেশি সময় লাগবে। তার ওপরে স্থলপথে বিপদ-আপদ অনেক বেশি। পরিষ্কার আকাশ আর তেজি হাওয়া পেলে জাহাজে অনেক তাড়াতাড়ি দেশে পৌঁছোনো যাবে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ তখন বন্দর থেকে অনেকটা দূরে মাঝসমুদ্রে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে ফ্লাইজারকে বলল, দিক ঠিক রেখে দেশের দিকে জাহাজ চালাও। ভাইকিং বন্ধুদের তখন আনন্দ দেখে কে! সবাই ছুটোছুটি করে সব পালগুলো টানাটানি করে দড়ি বেঁধেছেঁদে জাহাজের গতি বাড়াতে লাগল। পালগুলো যথেষ্ট হাওয়া পাচ্ছে। তবু সাত-আটজন ভাইকিং দাঁড়ঘরে নেমে এল। দাঁড় বাইতে লাগল। গতি চাই, আরো গতি। জাহাজ দ্রুত জল কেটে ঢেউ ভেঙে চলল।



তিন-চারদিন নির্বিঘ্নেই কাটল। ভাইকিংরা দেশে ফেরার চিন্তায় খুব খুশি। যার সবচেয়ে বেশি সাবধানী হওয়া উচিত ছিল সেই নজরদার পেড্রোও খুশিতে ওর কাজে ঢিলে দিল। এক রাতে মাস্তুলের মাথায় ওর নির্দিষ্ট জায়গায় বসে নজর রাখল না। ডেক-এ অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিজেও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবল, অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নজরদারির জায়গায় গিয়ে বসবে। পেড্রোর এই ভুলের জন্যে সবাইকে তার খেসারত দিতে হলো।

তখন ভোর হয় হয়। পেড্রোর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসতেই সামনে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক কাফ্রি। পেড্রো ভয়ার্ত চোখে চারদিকে তাকাল। দেখল ওদের জাহাজের গায়ে গা লাগিয়ে আর একটা জাহাজও চলেছে। ডেক-এ যেখানে যেখানে ওর বন্ধুরা শুয়ে ঘুমুচ্ছে তাদের সকলের সামনে একজন করে খোলা তরোয়াল হাতে কাফ্রি দাঁড়িয়ে। কাফ্রিরা নিঃশব্দে ওদের ক্যারাভেল জাহাজ থেকে এই জাহাজে উঠে এসে জাহাজ দখল করে নিয়েছে।

ভোরের আধো আলো, আধো অন্ধকারে পেড্রো বোকার মতো তাকিয়ে রইল কাফ্রিটার দিকে। একবার ভাবল, চিৎকার করে সবাইকে ডাকে। কিন্তু কাফ্রিটা ওর মনোভাব বুঝতে পেরে তরোয়ালের ডগাটা পেড্রোর গলায় ঠেকিয়ে মাথা দুলিয়ে হাসল। ঐ কুচকুচে কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো চকচক করে উঠল।

ভোর হলো। ডেক-এ শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা ভাইকিংদের ঘুম ভাঙতে লাগল। চোখ মেলে সবাই দেখল খোলা তরোয়াল হাতে কাফ্রি যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে। ওরা অসহায় চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল। ওদের তখন একটাই ভাবনা কেবিনঘরে বোধহয় ফ্রান্সিস হ্যারিরা নিরাপদেই আছে।

একটু পরেই ভোরের নরম আলো পড়ল সমুদ্রে জাহাজ দুটোয়। তখনই ডেকঘর থেকে একে একে উঠে আসতে লাগল ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারিরা। প্রত্যেকের পেছনেই কাফ্রি যোদ্ধারা। ফর্সা গা আরবীয় যোদ্ধারাও আছে তাদের মধ্যে। এত নিঃশব্দে এই কাফ্রি যোদ্ধারা জাহাজটা দখল করে ফেলল যে ভাইকিংরা এতটুকুও বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিসরা ডেক-এ উঠে আসতে একটি আরবীয় যোদ্ধা গ্রীক ভাষায় বলল, সবাই জাহাজের রেলিঙের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াও। ভাইকিংরা গ্রীকভাষা কিছুই বুঝল না। তখন হ্যারি গলা চড়িয়ে ওদের ভাষায় কথাটা বুঝিয়ে বলল। এবার ভাইকিংরা রেলিঙের ধারে সারি বেঁধে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস এবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে পেড্রোকে খুঁজতে লাগল। দেখলও পেড্রোকে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে পেড্রো। ফ্রান্সিস ডাকল, পেড্রো। পেড্রো চমকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ছুটে এসে ফ্রান্সিসের দুই হাত জড়িয়ে ধরল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমরা এভাবে বন্দী হবো। ফ্রান্সিস, আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্যে আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও, দাও।

এখন ওসব কথা অর্থহীন। এখন এরা আমাদের নিয়ে কী করবে সেই কথা ভাবো। ফ্রান্সিস বলল।

একজন আরবী সৈন্য এসে পেড্রোর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিল। পেড্রো সারির মধ্যে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। দু'তিনজন ভাইকিং চিৎকার করে বলে উঠল, ফ্রান্সিস, পেড্রোকে ফাঁসিতে লটকাও। অনেকে ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে শান্ত হয়ে থাকতে বলল। এইভাবে বিনা বাধায় বন্দী হওয়াটা ভাইকিংরা মেনে নিতে পারল না। সবাই মনে মনে গজরাতে লাগল।

তখন সকাল হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় রোদ ঝিকিয়ে উঠছে। জোর হাওয়া বইছে। সাগরপাখির তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। দু'টো জাহাজই পাশাপাশি চলেছে।

ক্যারাভেল জাহাজ থেকে এক আরবীয় যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের জাহাজের রেলিং ধরে উঠে এল। আরবী ভাষায় গলা চড়িয়ে কী বলল। যোদ্ধাদের মধ্যে বেশ তৎপরতা দেখা গেল। বোঝা গেল কেউ একজন ফ্রান্সিসদের জাহাজে আসবে এবং সে যে দলপতি এটাও বোঝা গেল।

একটু পরেই ক্যারাভেল জাহাজের ডেক-এ উঠে এল একজন আরবীয়। মাথায় কান-ঢাকা কালো বিড়ে বাঁধা পাগড়ি মতো। সে দু'একজন যোদ্ধার সাহায্যে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসদের সারির কাছে এল। দলপতির গোঁফ আছে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। গায়ের রং ফর্সা। শরীরটা রোগাই।

দলপতি এবার ফ্রান্সিসদের দেখে খুব খুশি হলো। দু'তিনজন যোদ্ধা দলপতিকে কী বলল। দলপতি মাথা অল্প ঝাঁকিয়ে খুশিমুখে হাসল। ফ্রান্সিস তখনও ভেবে পাচ্ছে না এরা কারা? ফ্রান্সিসদের দেখে দলপতির এত খুশি হবার কারণ কী?

এবার দলপতি গ্রীক ভাষায় বলল, তোমাদের দেখেই তো বুঝতে পারছি তোমরা এই ভূমধ্যসাগরের এলাকার লোক নও—তোমরা বিদেশী। এক হ্যারি বাদে ফ্রান্সিসরা কেউই কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না। হ্যারি গ্রীক ভাষা মোটামুটি বোঝে। বলতেও পারে। হ্যারি ভাঙা ভাঙা গ্রীকভাষায় বলল, আমরা ভাইকিং। বীরের জাতি।

দলপতি এবার হ্যারির কাছে এল। হেসে বলল, হ্যাঁ তোমাদের ভাইকিং জাতির নাম আমরা শুনেছি। জাহাজ চালাতে দক্ষ তোমরা, আবার লুঠপাটও করো।

না—আমরা জলদস্যুতা করি না। হ্যারি বলল।

থাক গে—শোন—আমার নাম আল জাহিরি—আমি বণিক। দলপতি বলল।

আপনার কীসের ব্যবসা? হ্যারি বলল।

মানুষ কেনাবেচা। আল জাহিরি কথাটা

বলে হো হো করে হেসে উঠল। ফ্র্যান্সিস বুঝল—খুবই বিপদে পড়েছে ওরা। আল জাহিরির জাহাজে নিশ্চয়ই কয়েদখানামতো আছে। সেটাতে মানুষদের বন্দী করে রাখা হয়। তারপর ক্রীতদাসদের বিকিকিনির হাটে বিক্রি করা হয়। হ্যারি বলল, বুঝেছি—আপনি আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করবেন।

ঠিক তাই—আল জাহিরি হেসে বলল, এটাই আমার ব্যবসা।

হ্যারি দেখল, আল জাহিরির গায়ে বেশ দামী রেশমি কাপড়ের সোনালি জরি বসানো পোশাক। গলায় মুক্তোর মালা। হ্যারি একটু হেসে বলল, তাহলে আপনার ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে?

আল জাহিরিও হাসল। বলল, হ্যাঁ—তবে এবার খুব ভালো দাম পাবো।

কেন? হ্যারি জানতে চাইল।

কারণ—ইউরোপীয় মানুষ আমরা কমই পাই। এবার এতগুলি যুবক ইউরোপীয়—ওঃ অনেক দাম পাবো। আল জাহিরি বলল। তারপর মারিয়াকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এটার জন্যেই যা দাম পাবো তাতে কয়েক বছর আর মানুষ না ধরলেও চলবে।

হ্যারি বলল, মুখ সামলে কথা বলুন—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী মারিয়া। আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী।

আল জাহিরি চোখ বড় বড় করে বলল, রাজকুমারী, বাব্বা—তাহলে তো দর আরও চড়াতে হবে।

হ্যারি কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। চুপ করে রইল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে আল জাহিরির সঙ্গে ওর যা কথাবার্তা হয়েছে সবই বলল।

সব শুনে ফ্রান্সিস গভীর চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিসরা জানে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা কী নির্মম নিষ্ঠুর হয়। দয়া মায়া বলে কোনো বোধই এদের থাকে না। বন্দী মানুষদের দেখে পশুর মতো।

আল জাহিরি চিৎকার করে বলতে লাগল, সব কটাকে আমাদের ক্যারাভেল-এ নিয়ে যাও। কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ইনি নাকি রাজকুমারী। ইনি মুক্ত থাকবেন।

হ্যারি বলে উঠল, না ইনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

তা কী করে হয়—আল জাহিরি বলল, একে কত যত্নে রাখতে হবে। কয়েদখানায় থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। না, না—রাজকুমারী আলাদা কেবিনঘরে থাকবে।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে কথাগুলো বুঝিয়ে বললো। অন্য ভাইকিং বন্ধুরা শুনল সে কথা। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো—।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল, আল জাহিরি, দেখছেন তো রাজকুমারীকে আলাদা করে রাখতে কেউ রাজী নয়। রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

আল জাহিরি ভাইকিংদের ক্রুদ্ধ চেহারা আর ধ্বনি শুনে একটু ভাবনায় পড়ল। ভাইকিংরা নিরস্ত্র। ওর পাহারাদারদের হুকুম দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিরস্ত্র ভাইকিংদের মেরে ফেলা যায়। কিন্তু তাতে কী লাভ? বরং বাঁচিয়ে রাখলে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পাবে। শুধু রাজকুমারীকে বিক্রি করলেই হাজার কয়েক স্বর্ণমুদ্রা মিলবে। কাজেই আল জাহিরি কোনো গোলমালে যেতে চাইল না। মারিয়াকে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল, রাজকুমারী, আপনি কি কয়েদখানার অন্ধকারে পচতে চান না কোনো কেবিনঘরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মধ্যে থাকতে চান?

মারিয়া বলল, আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই না। আমার স্বামী আর তার বন্ধুরা যেখানে যেভাবে থাকবে আমিও সেখানে থাকবো।

কী মুশকিল—তাতে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ক্রীতদাসের হাটে আপনার দাম কমে যাবে যে। আল জাহিরি মাথা নেড়ে নেড়ে বলল।

সেসব আমি বুঝি না। মারিয়া বলল।

আল জাহিরির ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় কথা বিস্কো শাঙ্কোরা বুঝল। ওরা আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো।

এবার আল জাহিরি বলল, আমি ব্যবসাদার লোক—মারামারি কাটাকাটির মধ্যে নেই। তোমরা সবাই ক্যারাভেলের কয়েদখানায় থাকবে। মনে থাকে যেন, পালাবার চেষ্টা করলে মরবে।

আল জাহিরি নিজেদের ক্যারাভেলে চলে গেল। কাফ্রি আর আরবী পাহারাদাররা এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে গ্রীক ভাষায় চিৎকার করে বলল, ক্যারাভেলে চলো সব। কেউ চালাকি দেখাতে গেলেই মরবে।

হ্যারি ওদের দেশীয় ভাষায় কথাগুলি বন্ধুদের বুঝিয়ে বলল।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না, আমাদের জাহাজ ছেড়ে আমরা যাবো না। বন্ধুরা হৈহৈ করে শাঙ্কোকে সমর্থন করল। পাহারাদার সৈন্যরা বুঝল ওরা ক্যারাভেল-এ যেতে আপত্তি করছে। ওরা খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে সৈন্যদের থামাল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ভাইসব, আমরা ভালো করেই জানি আল জাহিরি আমাদের মেরে ফেলবে না। তাতে ওর ব্যবসারই ক্ষতি। তবে নিরস্ত্র অবস্থায় লড়াইয়ে নামলে আমরা অনেকেই আহত হবো। আমি এটা চাই না। এখন লড়াই নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ক্যারাভেল-এ চলো। বন্দীজীবন মেনে নাও। সময় সুযোগ বুঝে যা করবার করা যাবে। ক্যারাভেল-এ চলো সব।

ভাইকিং বন্ধুরা বুঝল যে এই অবস্থায় ফ্রান্সিসের কথাই মেনে নিতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পাহারাদারদের নির্দেশমতো ক্যারাভেল-এ গিয়ে উঠতে লাগল।

আল জাহিরির সৈন্যদের পাহারার মধ্যে ভাইকিংরা ক্যারাভেল-এ গিয়ে উঠল। ক্যারাভেল-এর সিঁড়ি বেয়ে

একেবারে নিচের কয়েদখানার সামনে এল সবাই। কয়েদখানার লোহার দরজার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে দু'তিনজন পাহারাদার। একজন গিয়ে লোহার দরজা খুলে দিল। ঠন্‌ঠন্‌ শব্দে দরজা ঠেলে ভাইকিংদের ঢোকানো হতে লাগল।

এরকম কয়েদখানা ভাইকিংরা আগেও দেখেছে। কিন্তু মারিয়া তো দেখেনি, লোহার মোটা মোটা গরাদ দেওয়া। মারিয়া এইবার প্রথম বেশ ভীত হলো। এখানে তো পশুর মতো থাকতে হবে। মারিয়া এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। ফ্রান্সিস মারিয়ার মনের অবস্থা ভালোই বুঝতে পারল। মারিয়ার হাতে চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ভয়ের কিছু নেই। তবে কষ্ট হবে তোমার। তুমি যদি ওপরের কেবিনঘরে থাকতে চাও—

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না—আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। কয়েদঘরে ঢুকে দেখল আগে থেকেও পাঁচ-ছজন বন্দী রয়েছে। সবাই কাফ্রি। শুধু একজন শ্বেতাঙ্গ। বোধহয় এই এলাকার লোক। জোব্বামতো চাষীদের পোশাক পরনে। একটা ব্যাপার দেখে ফ্রান্সিস খুশি হলো যে এই কয়েদঘরে ওদের হাত বেঁধে রাখা হলো না। তার কারণটাও ফ্রান্সিস ঠিক বুঝতে পারল—হাত-পা অনেকদিন বেঁধে রাখলে কড়া পড়ে যায়। ক্রীতদাস বিক্রির হাটে দাম কমে যায়। সুস্থ সবল মানুষ চাই। তবে না দাম উঠবে।

ভাইকিংদের মধ্যে কিছু বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল কাঠের পাটাতনে, কেউ কেউ ছোট জায়গাতেই পায়চারি করতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া এককোণায় বসল। হ্যারি এসে ওদের পাশে বসল। তিনজনই চুপচাপ বসে রইল। এমনভাবে এত দ্রুত ওরা বন্দী হয়ে যাবে এটা কল্পনাও করেনি।

কিছু পরে লোহার দরজা শব্দ তুলে খোলা হলো। তিনজন কাফ্রি খাবার নিয়ে এল। এক মস্তবড় কাঠের থালায় গোল করে কাটা রুটি। মস্তবড় গামলায় আলু টমেটোর মাংস ছড়ানো স্যুপ। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। আজ ফ্রান্সিস কিন্তু সেই কথাটা বলতে পারল না—পেট পুরে খাও—খেতে ভালো না লাগলেও খাও। সত্যিই আজ ফ্রান্সিসের মন চিন্তাভারাক্রান্ত। এই তলার ডেক-এর কয়েদখানায় থাকার অভিজ্ঞতা ওদের আছে। কিন্তু মারিয়া কি এই কঠোর জীবন কাটাতে পারবে? তার ওপর অসুখ থেকে উঠে মারিয়া এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। হঠাৎ-ই ফ্রান্সিসের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ও চুপ করে বসে রইল। ওর সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হলো মারিয়ার জন্যে।

একসময় বিস্কো উঠে গেল। ভালো লাগছে না। এভাবে বন্দী হওয়া স্বপ্নেও ভাবেনি। সময় কাটাবার জন্যে পুরনো বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বিস্কো ওদের কাছে গেল। কাফ্রি ক'জনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। সবই বৃথা। কাফ্রিগুলো যে ভাষায় কথা বলল, সে তো অবোধ্য। কথা বলার সময় ওদের অঙ্গভঙ্গি দেখে যা কিছু বুঝল সেটাও তেমন কিছু নয়। অনেকদিন আগে আল জাহিরির দল নাকি ওদের গ্রাম থেকে ধরে এনেছে। ভাগ্যে কী আছে ওরা জানে না।

শুধু একজন শ্বেতাঙ্গ অল্পস্বল্প স্প্যানিস ভাষা বলতে পারে। তার সঙ্গেই বিস্কো কথাবার্তা বলতে লাগল। সে তার নাম বলল পারিসি। পারিসি বিস্কোকে বলল, তোমরা তো দেখছি এই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের লোক নও। তোমরা এখানে কেন এসেছো? ধরাই বা পড়লে কীভাবে? বিস্কো তখন ওদের কথা, ফ্রান্সিসের কথা—কোন দ্বীপ থেকে ফ্রান্সিস কী উদ্ধার করেছে সবকিছুই সংক্ষেপে বলল। পারিসি বলল, আমিও একটা খুব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ উদ্ধার করেছিলাম। নিয়েছিলাম সাইপ্রাসের বর্তমান শাসক গী দ্য লুসিগনানকে। সেই গ্রন্থের প্রথম পাতায় আঁকা ছিল যীশুর একটা ছবি। এবার লুসিগনান চাইল সেই যীশুর মূর্তিটা। নিশ্চয়ই আমিই সেই মূর্তিটা লুকিয়ে রেখেছি এই সন্দেহ করে আমার ওপরে চলল অত্যাচার। পারিসি থামল।

তারপর? বিস্কো জানতে চাইল।

আমাকে আবার সেই দুরারোহ জেবস পাহাড়ে পাঠাল। আমি সুযোগ বুঝে পালালাম। চলে এলাম কেরিনিয়া বন্দরে। পর্তুগীজদের একটা জাহাজে উঠে পড়লাম। জাহাজটা তখন পর্তুগালেই যাচ্ছিল। হঠাৎই আল জাহিরি আমাদের জাহাজ আটকাল। লড়াই হলো। নৃশংস আল জাহিরি প্রায় সবাইকে মেরে ফেলল। কয়েকজন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল, মা মেরিই জানে হাঙরের পেটে গেল না পালাল। আমাকে আর ঐ কাফ্রি কয়েকজনকে রেহাই দিল। এরমধ্যে অবশ্য একজন কাফ্রি পালাতে গিয়ে মারা গেল। পারিসি থামল।

বিস্কো বলল, তুমি কী একটা গ্রন্থের ছবি যীশুর মূর্তি এসবের কথা বললে।

সে অনেক কথা। পারিসি বলল।

বিস্কো উঠে দাঁড়াল। বলল, আমার বন্ধু ফ্রান্সিসকে নিয়ে আসছি। তুমি তাকে ব্যাপারটা বলো তো।

একটু পরেই বিস্কো, ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়াকে সেখানে নিয়ে এল। পারিসির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বলল, তোমার কথা বিস্কোর কাছে কিছু শুনলাম। এবার সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো তো।

পারিসি বলল, সাইপ্রাস দ্বীপের নাম শুনেছেন? ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। হ্যারি বলল—শুনেছি।

মারিয়া বলল, সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরের পুবদিকের শেষ দ্বীপ।

ঠিক বলেছেন। পারিসি বলল। তারপর বলল, সাইপ্রাসের একটু ইতিহাস বলি। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শেষ করে প্রথম রিচার্ড ফেরার পথে সাইপ্রাসে আসেন। তখনকার শাসক আইজাক কমেনাসের কাছে দাবি জানালেন, এখানে তাঁর যে জাহাজগুলো আছে সেসব আর তাঁর দেশের নাবিকদের ফেরৎ দিতে হবে। আইজাক মানল না



ফ্রান্সিস শান্ত হও।

সেই দাবি। প্রথম রিচার্ড সাইপ্রাসবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে সাইপ্রাস দখল করলেন। তাঁর অনুগত গী দা লুসিগনানকে সাইপ্রাসের শাসক নিযুক্ত করে তিনি চলে গেলেন। গী দা লুসিগনানও আইজাকের মতো সাইপ্রাসবাসীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। পারিসি থামল।

আসল কথাটা বলো। ফ্রান্সিস বলল।

সেটাই বলছি—পারিসি বলল, এবার একজন প্রকৃত খ্রীস্টিয় সাধুর কথা বলি। তাঁর নাম নিওফিতস। ছোটবেলা থেকেই তিনি খ্রীস্টিয় সাধু হতে চেয়েছেন। উত্তর সাইপ্রাসের বন্দর-নগর কেরিনিয়ার কাছে এক গির্জা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে লোকজনের ভিড়ে বিরক্ত হয়ে তিনি জেরস পাহাড়ে এক গুহায় একেবারে নির্জনে বাস করতে লাগলেন।

তারপর? হ্যারি বলল।

সাত বছর ধরে এক কষ্টকর জীবন কাটালেন তিনি। ধারেকাছের পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে খাদ্য, পানীয়, জল দিয়ে আসতো। নিওফিতস নিজে কারো কাছে কিছু চাইতেন না। এদিকে মহান সাধুপুরুষ হিসেবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত হন তিনি। এখন ঐ এলাকার নাম পাফোস। পাফোসের গীর্জার পাদ্রীরা নিওফিতসকে বারবার অনুরোধ জানাতে তিনি সেই গুহার আবাস ছেড়ে নিচে নেমে আসেন। শুরু হলো নিওফিতসের নতুন জীবন। খ্রীস্টিয়মণ্ডলীর কাজেকর্মে তিনিই নিয়মশৃঙ্খলা আনেন এবং এই নিয়ে তিনি বই লিখতে শুরু করেন।

ঐ বইটাই বোধহয় তুমি পেয়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

না, কারণ তখন সবেমাত্র নিওফিতস লিখতে শুরু করেছিলেন। পারিসি বলতে লাগল, অদ্ভুত মানুষ এই নিওফিতস। এত খ্যাতি, এত জনপ্রিয়তা তাঁর সহ্য হলো না। তিনি আবার গুহাবাসী হলেন। জেরস পাহাড়ের যে গুহায় ছিলেন, এই গুহাটা সেটার চেয়েও অনেক উঁচুতে। প্রায় অসম্ভব সেই গুহায় যাওয়া। নিওফিতস কোনোভাবে সেই গুহায় গিয়ে উঠলেন। নিজেই ওখানে বসে বসে শুকনো ঘাস, গাছের ডাল দিয়ে একটা মই করলেন। প্রতিদিন সকালে সেই মই নামিয়ে দিতেন নিচের একটু সমতলমতো একটা জায়গায়। পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা খাবার-টাবার রেখে আসত সেখানে। সবাই চলে গেলে নিওফিতস দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে খাবার নিতেন তারপর উঠে যেতেন। সঙ্গে সঙ্গে দড়ির মইটাই টেনে তুলে নিতেন যাতে কেউ ঐ মই বেয়ে তাঁর গুহায় যেতে না পারে, তাঁকে বিরক্ত করতে না পারে। পারিসি থামল।

তারপর? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

পারিসি বলতে লাগল—নিওফিতস যে খ্রীস্টমণ্ডলীর পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে বই লিখছেন—এটা এখানকার সব বিশপ ধর্মযাজকরা জানতেন। তাঁরা আমাকে

দায়িত্ব দিলেন—নিওফিতসের বইটা নিয়ে আসতে। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল, আমি অনেক কষ্টে সমতলমতো জায়গাটায় পৌঁছলাম। কিন্তু নিওফিতসের গুহায় উঠতে পারলাম না। নিচের যে সমতল জায়গায় পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা খাবার রেখে যেত, আমি সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেখানে। কাঠকুটো জ্বেলে আমি রাত কাটাতাম। পারিসি একটু থেমে বলতে লাগল—আমি কয়েকদিন পরে পরেই দেখতাম দড়ির মই ফেলে নিওফিতস খাবার-টাবার নিয়ে যেতেন। আশ্চর্য! জলভরা পাত্র নিতেন না। বুঝলাম নিশ্চয়ই ঐ গুহার কাছে পাহাড়ি ঝর্ণা আছে। একদিন নিওফিতস মইটা তুলে নেবার আগে আমি মইয়ের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে দিলাম। নিওফিতস সেটা বুঝলেন না। তিনি ওপরে উঠে মই টেনে তুলে নিলেন। দড়িটা ঝুলতে লাগল। পারিসি থামল।

তাহলে মই নামিয়ে তুমি তো উঠতে পারতে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ—আমি তাই করেছিলাম। একনাগাড়ে প্রায় দিন সাতেক নিওফিতস নিচে নামলেন না। তখন তাঁর বয়েস সত্তরেরও বেশি। বুঝলাম, তিনি নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি আর অপেক্ষা না করে দড়িতে বাঁধা মইটা টেনে নামালাম। খাবার-টাবার নিয়ে মই বেয়ে সেই গুহার মুখে উঠে এলাম। বাইরে ঝকঝকে রোদ। গুহার ভেতরটা কিন্তু অন্ধকার। আমি আস্তে আস্তে গুহার মধ্যে ঢুকলাম। অন্ধকারটা চোখে একটু সয়ে আসতে দেখলাম গুহার গায়ে মশাল বসানো। কিন্তু তখন নিভে গেছে। অস্পষ্টভাবে দেখলাম এবড়োখেবড়ো মেঝেয় মোটা কাপড়ের বিছানা। তারপরেই একটা অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু এখন নিভে গেছে। বিছানায় অসাড় শুয়ে আছেন নিওফিতস। প্রথম দেখে বুঝলাম না বেঁচে আছেন কিনা। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল—আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে তাঁর দুই পা চুম্বন করলাম। মোটা কাপড়ে ঢাকা একটা পা যেন একটু নড়ল। আমি তাড়াতাড়ি এসে নিওফিতসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। দেখি নিওফিতস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সর্দিবসা গলায় খুব আস্তে বললেন—তুমি কে? আমি বললাম—আমি পারিসি। আপনার সেবা করতে এসেছি।

আমার সেবার প্রয়োজন নেই। সেই একইভাবে বললেন।

আমি মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললাম, আপনার সেবা করতে পারলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। যীশুর নামে বলছি—আমাকে এটুকু সুযোগ দিন। নিওফিতস কী ভাবলেন। তারপর কাশতে লাগলেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর বুকে হাত বুলোতে লাগলাম। কাশির কষ্টটা কমতে আগের মতোই মৃদুস্বরে বললেন—বইটা শেষ করতে পারিনি। বইটা শেষ করার জন্যে আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। কিন্তু শরীরে জোর পাচ্ছি না। ওরকম এক মহাপুরুষের এমন অসহায় অবস্থা দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। কেঁদে ফেললাম। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমি আপনাকে সুস্থ করে তুলবো।

কিন্তু এই ঠাণ্ডায় এখানে তুমি থাকবে কী করে? উনি বললেন। আমি বললাম—আমার জন্যে ভাববেন না। খাবার এনেছি। অনুমতি দিন—আপনাকে যেন খাওয়াতে পারি।

বেশ। নিওফিতস বললেন। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল—আমি দেখলাম নিভে-যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে চকমকি পাথর রয়েছে। গুহার একপাশে বেশ শুকনো ডালপালাপাতা কাঠ রয়েছে। আমি কিছু কাঠ ডালপাতা দিয়ে অগ্নিকুণ্ড সাজালাম। তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বাললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। সেখান থেকে আগুন নিয়ে পাথরের খাঁজে রাখা মশাল জ্বাললাম। এতক্ষণে গুহার ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আমার কোমরের ফেট্টির কাপড়টা খুলে আগুনে গরম করে করে সেই মহাপুরুষের পায়ে-হাতে-বুকে সেঁক দিতে লাগলাম। গুহাটাও ততক্ষণে বেশ গরম হয়ে গেছে। নিওফিতস এবার অসাড় হাত পা শরীরে সাড় পেলেন। হাত-পা নাড়লেন। উঠে বসার চেষ্টা করলেন। আমি পিঠে দু'হাত জড়িয়ে আস্তে আস্তে তাঁকে বসালাম। খেতে দিলাম। উনি আস্তে আস্তে খেতে লাগলেন। আমার সেদিন যে কী আনন্দ হয়েছিল বলে বোঝাতে পারবো না। এবার জল খাওয়ানো। জল তো আমি আনিনি। পারিসি থামলো।

ধারে কাছে নিশ্চয়ই পাহাড়ি ঝর্ণা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক তাই—পারিসি বলল, উনি বললেন, এই গুহার শেষে গিয়ে দেখ একটা পাহাড়ি ঝর্ণা পাবে। সেখান থেকে জল নিয়ে এসো। আমি গুহার শেষে এসে দেখলাম গুহার ছোট্ট মুখ। তারপরেই একটা [illegible] ঝর্ণা। সেই জল নিয়ে এসে নিওফিতসকে খাওয়ালাম, নিজেও খেলাম। নিওফিতস আবার শুয়ে পড়লেন। আমিও খাওয়া সেরে ঐ এবড়োখেবড়ো মেঝের একপাশে শুয়ে পড়লাম।

তারপর? হ্যারি বলল।

এ ভাবেই সেবা-শুশ্রূষা করে নিওফিতসকে অনেকটা সুস্থ করে তুললাম। উনি কাগজ-কলম নিয়ে প্রত্যেকদিনই গ্রন্থটি লিখতেন। বোধহয় শেষ হয়ে যেত লেখা। কিন্তু শীতকাল পড়তেই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তিনি দেহরক্ষা করলেন। আমি সারারাত কাঁদলাম। তারপর সেই শেষ না হওয়া গ্রন্থটি নিয়ে নিচে নেমে এলাম।

গ্রন্থ পেয়ে তো সাইপ্রাসের শাসকের খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু কী এমন ঘটল যে তোমাকে পালাতে হলো? ফ্রান্সিস বলল।

সেটাই সমস্যা। গ্রন্থটির প্রথম পাতায়

সাধু নিওফিতস যীশুর একটি কাঠের মূর্তি এঁকেছিলেন। এত জীবন্ত ছবি খুব কম দেখা যায়। এখন সাইপ্রাসের শাসক গী দ্য লুসিগনান সন্দেহ করল যে সেই কাঠের মূর্তিটা নিওফিতস সত্যি সত্যিই নিজের হাতে বানিয়েছিলেন। আমি সেটা চুরি করেছি। আমি বারবার বললাম, আমি সেই কাঠের মূর্তি চোখেই দেখিনি। লুসিগনান বলল, ঐ গ্রন্থের ভূমিকাতেই নাকি সাধু নিওফিতস ঐ মূর্তি নিজের হাতে তৈরি করার কথা বলেছেন। কাজেই আমাকে আবার কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে সেই গুহায় পাঠানো হলো। আমি সুযোগ বুঝে পালালাম।

ঐ কাঠের যীশুমূর্তি কি সত্যিই নিওফিতস তৈরি করেছিলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আমি অতদিন গুহায় ছিলাম। কোনোদিন কাঠের তৈরি যীশুমূর্তি কোথাও দেখিনি। পারিসি বলল।

আচ্ছা—ঐরকম কাঠের যীশুমূর্তি সম্পর্কে নিওফিতস কি কখনো তোমাকে কিছু বলেছিল? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

না। তবে মাঝে মাঝে যখন ঝর্ণার জলে পা ধুতে যেতেন—বলতেন যীশুও আমার সঙ্গে স্নান করবেন। পারিসি বলল।

এ কথার মানে কী? হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

এটা ঐ গুহা, ঝর্ণার চারপাশ ভালো করে না দেখে বলা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

ঢচাং ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলল। রক্ষীরা খাবার নিয়ে ঢুকল। খাবার দেখে ভাইকিংরা একটু অবাকই হলো। মাখন মাখানো কাটা গোল রুটি, শাকসব্জির জুস আর কাঠের থালাভর্তি মাংস। খুবই সুস্বাদু খাবার। সবাই পেট পুরে খেলো। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল—ক্রীতদাসের হাটে নীরোগ সুস্থ স্বাস্থ্যবান যুবকদের দাম বেশি। তাই সবাইকে সুস্থ রাখতে হবে। তাই কয়েদীদের জন্যে এই রাজকীয় খানা।

আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজ চলেছে। পেছনে কাছি দিয়ে বাঁধা ফ্রান্সিসদের জাহাজ।

এর মধ্যে দু'বার ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়েছে। ঝড়ের সময় সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় কয়েদঘরের বন্দীদের। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনিতে একবার কয়েদঘরের এই মাথায়, পরক্ষণেই গড়িয়ে গিয়ে ঐ মাথায়। ফ্রান্সিসরা এসবে অভ্যস্ত। কিন্তু মারিয়া তো এ জীবন কখনও কাটায়নি। ওর কষ্ট হলো সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়বার ঝড়ের সময় জাহাজের কাঠে মাথায় ধাক্কা লেগে মারিয়া প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এই ঝড়ের সময় ফ্রান্সিস সমস্ত শরীর দিয়ে মারিয়াকে চেপে ধরে রাখে। গড়াগড়ি খায়। মেঝের কাঠের দেয়ালে যা ধাক্কা লাগার ফ্রান্সিসের শরীরেই লাগে। মারিয়ার শরীর যাতে অক্ষত থাকে। তবু মাথায় লেগেছিল। অবশ্য ভেন-এর চিকিৎসায় মারিয়া সুস্থ হলো।

ক্যারাভেল আর জাহাজ চলেছে। ফ্রান্সিসদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝতে পারছে না। কয়েদঘরের রক্ষীদের কয়েকদিনই হ্যারি জিজ্ঞেস করেছে—কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের? রক্ষীরা চুপ করে নিজেদের কাজ করে যায়। কোনো কথা বলে না। একজন রক্ষী একদিন বলেছিল—আল জাহিরি কী করেন তা আগে থেকে কাউকে বলেন না। ব্যস এইটুকুই জেনেছে ওরা।

একদিন সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা শুয়ে-বসে আছে, হঠাৎ রক্ষীদের মধ্যে খুব তৎপরতা দেখা গেল।

একটু পরেই আল জাহিরি গরাদের কাছে এসে দাঁড়াল। কাষ্ঠহাসি হেসে স্পেনীয় ভাষায় বলল—খাওয়াদাওয়া ভালো পাচ্ছো তো?

হ্যাঁ—হ্যারি বলল, কিন্তু আমরা এখনও জানি না আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

সাইপ্রাসের উত্তরে কেরিনিয়া বন্দরে। ক্রীতদাস কেনাবেচার বড় হাট বসে ওখানে। ওখানে দরে না পোষালে আবার অন্য হাটে নিয়ে যাবো। আল জাহিরি বলল।

তাহলে ক্রীতদাস হিসেবে আমাদের বিক্রি করবেনই। হ্যারি বলল।

আল জাহিরি হো হো করে হেসে উঠল—তা না হলে ভালো ভালো খাবার খাইয়ে তোমাদের এত যত্নে রেখেছি কেন।

হ্যারি আর কোনো কথা বলল না। ঐ নরপশুটার সঙ্গে ওর আর কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। যা কথা হলো হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল—আর কোনো কথা বলো না। এরা সব হৃদয়হীন মানুষ। কথা বলারও অযোগ্য এরা। আল জাহিরি চলে গেল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল, ফ্রান্সিস এখান থেকে পালানোর উপায় বের কর।

হ্যারি, ফ্রান্সিস বলল, এখান থেকে পালানোর কোনো নিশ্চিত উপায় আমি ভেবে পাচ্ছি না। পালানো সম্ভব কিন্তু তাতে কিছু বন্ধুর প্রাণ যাবে, কারণ লড়াই করতেই হবে। তার চেয়েও বড় কথা মারিয়া। মারিয়া এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। লড়াইয়ে নামলে সব কিছু সারতে হবে অতি দ্রুত। মারিয়া তা পারবে না। হয়তো মারিয়ার জীবন বিপন্ন হবে। তাই আমি কী করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, পারিসিকে এখানে নিয়ে এসো।

হ্যারি পারিসিকে ডাকতে গেল। মারিয়া বলল, ফ্রান্সিস আমার জন্যেই তোমাদের এই ভোগান্তি ভুগতে হচ্ছে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, ও কথা বলছো কেন? তোমার কী দোষ?

আমার জন্যেই তো পালাতে পারছো না। মারিয়া বলল।

তোমার জন্যে নয়, লড়াই করে পালাতে গেলেই বন্ধুদের প্রাণহানি ঘটবে। এটা আমি চাই না। পালাবার অন্য কোনো উপায়ও ভাবতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

পারিসিকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল, আচ্ছা পারিসি, তুমি তো সাইপ্রাসেরই অধিবাসী। কেরিনিয়া বন্দর কেমন? খুব বড়ো বন্দর না ছোট?

খুব বড়ো বন্দর নয়। মাঝারি রকমের বন্দর-শহর। পারিসি বলল।

এখন সাইপ্রাসের শাসক তো গী দ্য লুসিগনান। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। পারিসি বলল।

নিওফিতসের গ্রন্থটি তো তুমিই উদ্ধার করে গী দ্য লুসিগনানকে দিয়েছিলে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। পারিসি মাথা ওঠানামা করে বলল।

কাঠের যীশুমূর্তিটা গী দ্য লুসিগনান তোমাকেই উদ্ধার করতে পাঠিয়েছিল আর তুমি তখন পালিয়েছিলে।

হ্যাঁ, আমি ওরকম মূর্তি ওখানে কোনোদিন দেখিনি। পারিসি বলল।

আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ওরকম একটা যীশুমূর্তি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

হতে পারে, আমি জানি না। পারিসি বলল।

দেখ পারিসি—ফ্রান্সিস বলল, তুমি বলেছিলে ঐ গ্রন্থটির প্রথম পাতায় যীশুর যে ছবিটি দেখেছিলে সেটা খুব সুন্দর ছবি ছিল।

শুধু সুন্দর নয়—পারিসি বলল, প্রভু যীশুর ওরকম জীবন্ত ছবি আমি কোথাও দেখিনি।

এমন ছবি যিনি আঁকতে পারেন—ফ্রান্সিস বলল—তিনি কাঠ কুঁদে কুঁদে ওরকমই একটা কাঠের মূর্তিও তৈরি করতে পারেন। নিওফিতস শুধু ধর্মপ্রাণ সাধুই ছিলেন না—প্রতিভাবান শিল্পীও ছিলেন।

তা ঠিক। পারিসি ঘাড় নেড়ে বলল। এবার হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

কিছু করার নেই—ফ্রান্সিস বলল, কেরিনিয়া পৌঁছে রাজা গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তারপর যীশুর কাঠের মূর্তি উদ্ধার করে আনবো, এই প্রস্তাব দেব।

কাঠের মূর্তিটা নিয়ে সবাই এত ভাবছে কেন আমি ঠিক বুঝতে পারি না। পারিসি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, সত্যিই সেই মূর্তিটা কাঠের। কারণ নিওফিতস এত ধনবান ছিলেন না যে সোনা হীরে মানিক দিয়ে অত উঁচুতে মূর্তি গড়বেন। কাজেই হাতের কাছে হয়তো ওক বা চেস্টনাট গাছ পেয়েছিলেন। তার ডাল কেটে কুঁদে কুঁদে মূর্তিটা গড়েছিলেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি—মূর্তিটা মূল্যবান অন্য কারণে। ভেবে দেখ একজন মহান সর্বত্যাগী সাধুপুরুষ সেই মূর্তিটা তিলে তিলে গড়েছিলেন। তাহলেই বুঝতে পারছো কী পবিত্র সেই মূর্তি। এই জন্যেই গী দ্য লুসিগনান মূর্তিটি উদ্ধার করার জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছিল। তুমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে এলে। তারপরেও হয়তো আরো লোক পাঠানো হয়েছিল। বোধহয় কেউই মূর্তিটা উদ্ধার করতে পারেনি।

আপনি পারবেন? পারিসি বলল।

দেখি। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

একদিন ভোর ভোর সময়ে আল জাহিরির ক্যারাভেল আর ফ্রান্সিসদের জাহাজ কেরিনিয়া বন্দরে এসে ভিড়ল। ঘড় ঘড় শব্দে নোঙর ফেলার শব্দ হলো। কয়েদঘরের অনেক ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিসেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হ্যারিকে ডাকল, হ্যারি। হ্যারি চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল, আমরা বোধহয় কেরিনিয়া বন্দরে এলাম।

তাই তো মনে হচ্ছে—হ্যারি বলল, দেখি পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করে।

দু'তিনজন পাহারাদার সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল। ভাইকিংদের খেতে দিল। খেতে খেতে হ্যারি একজন পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করল, জাহাজ কোন বন্দরে ভিড়ল।

কেরিনিয়া বন্দরে। এখানে তোমাদের বিক্রি করা হবে। সবাই পেট ভরে খাও। সবাই পেট পুরে খাও শরীর ঠিক রাখো। পাহারাদারটি ঠাট্টার সুরে বলল।

ফ্রান্সিস খাওয়া থামিয়ে হ্যারিকে বলল, পাহারাদারটি ঠাট্টার সুরে কী বলল?

ও কিছু না। হ্যারি বলল।

তবু বলো। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল। হ্যারি বুঝল যে ঠাট্টার সুরে পাহারাদারটি যা বলেছে তা শুনলে ফ্রান্সিস ভীষণ রেগে যাবে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল, হ্যারি—বলো। এবার হ্যারি আস্তে আস্তে বলল, বলল যে এখানে তোমাদের বিক্রি করা হবে। পেট ভরে খাও শরীর ঠিক রাখো। কথাটা হ্যারি বলে শেষ করতে না করতে ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে সেই পাহারাদারটির ঘাড়ে এক রদ্দা কষাল। পাহারাদারটি 'অঁক্' শব্দ তুলে কাঠের পাটাতনে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস পাহারাদারের কোমরে ঝোলানো তরোয়ালটা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল। এসব দেখে অন্য পাহারাদাররা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। কাঠের পাটাতনে ছিটকে পড়া পাহারাদারটি উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ওর গলায় তরোয়ালের ধারালো ডগাটা চেপে ধরে বলল, হ্যারি, এই রসিকটি ঠাট্টা করে যা বলেছে তার জন্যে তাকে ক্ষমা চাইতে বলো।

হ্যারি দ্রুত পাহারাদারটিকে গ্রীকভাষায় কথাটা বলল। ক্ষমা চাওয়া দূরের কথা ও চিৎকার করে বন্ধুদের ডাকল। ততক্ষণে আট-দশজন সৈন্য কয়েদঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস ওদিকে রুদ্রমূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্ফুটস্বরে ফ্রান্সিস বলল, সব কটাকে নিকেশ করবো।

হ্যারি কথাটা শুনে ভয়ে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ফ্রান্সিস শান্ত হও। তুমি লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না। মারিয়া এতক্ষণ অবাক চোখে ফ্রান্সিসের রাগের চেহারা দেখছিল। এবার হ্যারি রাজকুমারীকে বলল, আপনি ফ্রান্সিসকে শান্ত হতে বলুন।

মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস, শান্ত হও। আমাদের কথা ভুলে যেও না। ফ্রান্সিসের দৃঢ়ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরটা এবার নড়ল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে

তরোয়ালটা কাঠের মেঝেতে ফেলে দিল। আস্তে আস্তে বসে পড়ল। কাঠের থালাটা টেনে নিয়ে আধখাওয়া খাবার আবার খেতে লাগল।

এবার হ্যারি গ্রীক ভাষায় পাহারাদারদের বলল, তোমরা আর যাই কর, আমাদের এই বন্দীদশা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করো না। ফ্রান্সিসকে তোমরা চেন না। ওর হাতে তরোয়াল থাকলে তোমাদের মতো আট-দশজনকে একাই নিকেশ করতে পারে। কাজেই সাবধান, ফ্রান্সিসকে অনেক কষ্টে শান্ত করেছি আমরা। বাজে ঠাট্টা-রসিকতা করো না। এতক্ষণে সৈন্যরাও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝল। ওরা চলে গেল। পাহারাদাররাও এঁটো কাঠের থালা গ্লাস নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পাহারাদারদের মধ্যে তৎপরতা দেখা গেল। কয়েকজন সৈন্যও এল। একটু পরেই আল জাহিরি কয়েদখানার গরাদের সামনে এল। মুখে হাসির ভঙ্গী এনে স্পেনীয় ভাষায় বলল, আসার পথে তোমরা গোলমাল করোনি এজন্য ধন্যবাদ। এবার তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে ক্রীতদাস কুঠিরে। বিরাট ঘর। তোমরা আরামে থাকতে পারবে। তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই রয়েছে ওখানে। কোনোরকম চালাকি করো না, পালাবার চেষ্টা করো না। আমার মানুষ মারতে ইচ্ছে করে না। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতেই চাই আমি।

ক্রীতদাস হিসেবে—তাই না? ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

আল জাহিরি আবার কাষ্ঠহাসি হাসল। বলল, কী করি। এটাই তো আমার ব্যবসা। হ্যারির ভয় হলো ফ্রান্সিস না আবার চটে যায়।

হ্যারি তাই বলল, আল জাহিরি—আপনার কথামতোই আমরা চলবো।

আল জাহিরি চলে গেল।

সেদিন তখনও রাতের খাওয়া হয়নি। ফ্রান্সিস এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। এবার উঠে বসল। ডাকল—হ্যারি? হ্যারিও আধশোয়া হয়েছিল। উঠে বসল। বলল, কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, ভেবে দেখলাম—পারিসি যে খ্রীস্টমূর্তির কথা বলেছে সেটা উদ্ধার করতে আমাকে যেতে হবে। কিন্তু আল জাহিরি যেতে দেবে না। ওর মতো একটা নরপশুকে আমি এজন্য অনুরোধও করবো না। যে করেই হোক পারিসিকে নিয়ে আমি একা পালাবো। পারিসি এই সাইপ্রাসের লোক। ওর সাহায্যে আমি রাজা গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে দেখা করবো। আমার বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে এই শর্তে যীশুর মূর্তি উদ্ধার করতে যাবো।

কিন্তু—পারিসি বলছিল ঐ গুহার এলাকায় নাকি অসম্ভব শীত। ঠাণ্ডায় ঝর্ণার জল পর্যন্ত জমে যায়। হ্যারি বলল।

সেটা শীতকালে। এখন বসন্তকাল। খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়বে না—ফ্রান্সিস বলল, ঠাণ্ডার জন্যে ভাবি না—ভাবছি, ওরকম কাঠের মূর্তি আছে কিনা। যদি থাকে আপ্রাণ চেষ্টা করবো খুঁজে বের করতে। এছাড়া আমাদের মুক্তির কোনো আশা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তুমি একাই পালাবে? হ্যারি বলল।

একা নয় পারিসিকেও সঙ্গে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর পারিসিকে কাছে আসতে বলল। পারিসিকে পালাবার পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলল। এবার মারিয়াকে বলল, আমি আর পারিসি পালাবো। তুমি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করো না। তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হওনি। দুশ্চিন্তা হলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

না—আমি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করবো না। তুমি সফল হও—এই কামনা করি। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

তখন রাত হয়েছে। ঢঙাং ঢং শব্দ করে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। দু'জন পাহারাদার খাবার নিয়ে ঢুকল। সবাই বসে খেতে লাগল। ফ্রান্সিস আর পারিসি দরজার কাছে পায়চারি করতে করতে খেতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ভেজানো লোহার দরজাটা দ্রুত হাতে খুলে বাইরে চলে এল। পেছনে পারিসি। আচমকা এই ঘটনায় দরজার কাছে দাঁড়ানো দুই পাহারাদার হতবাক। ওর মধ্যে একজন ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে এল। ও কোমর থেকে তরোয়াল খুলছে তখনি ফ্রান্সিস ওর বুকে লাথি মারল। পাহারাদার ছিটকে কয়েদঘরের মেঝেয় পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। অন্য পাহারাদারটি কাছে আসার আগেই ফ্রান্সিস কাঠের থালা ছুঁড়ে মারল কাচে ঢাকা বাতিটার দিকে। কাচে ঢাকা বাতি ভেঙে চৌচির। অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা। পাহারাদার অন্ধকারে ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল না। পারিসির হাত ধরে ফ্রান্সিস ছুটল সিঁড়ির দিকে। কয়েদঘরের পাহারাদাররা চিৎকার চাঁচামেচি করতে লাগল। কিন্তু সেই শব্দ ওপরে ডেক পর্যন্ত এল না। কাজেই ডেক-এ দাঁড়ানো সৈন্যরা কিছুই বুঝল না।

সিঁড়ি দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ফ্রান্সিস পারিসিকে নিয়ে উঠে এল ডেক-এ। ডেক-এর সৈন্যদের দু'একজনের হাতে তরোয়াল। বাকিরা গল্পগুজব করছে। ফ্রান্সিস আর পারিসিকে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখে দু'একজন সৈন্য ছুটে এল। সৈন্যরা কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস পারিসির হাত ধরে বলল, আমার সঙ্গে লাফ দাও। দু'জনে একসঙ্গে লাফ দিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে ঝপাৎ করে সমুদ্রের জলে পড়ল।

সব সৈন্য পাহারাদাররা ডেক-এর ধারে এসে রেলিং ধরে চিৎকার চাঁচামেচি করতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস আর পারিসি ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ফ্রান্সিস আর পারিসি ডুব সাঁতার দিয়ে বেশ কিছুটা গিয়ে আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল ক্যারাভেল-এর ডেক-এ আল জাহিরি এসে দাঁড়িয়েছে।

ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল, কোনোরকম শব্দ না করে আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে



শুরু হলো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া।

চলো। একটু দূরে গিয়ে আমরা সমুদ্রতীরে উঠবো। দু'জনেই আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তীরে পৌঁছল। পেছল পাথর বালির ওপর দিয়ে হেঁটে এসে তীরে উঠল। মাথার জল ঝাড়তে ঝাড়তে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, এই জলেভেজা অবস্থায় কোথাও একটু আশ্রয় তো নিতে হবে।

কিছু ভাববেন না। আমার বাড়িটা তো আছে। পারিসি বলল।

তোমার বাড়িতে কে আছে? ফ্রান্সিস বলল।

আমার বুড়ি মা। তবে বেশ কয়েক মাস তো আমি বাইরে বাইরে। মার কী অবস্থা জানি না। পারিসি বলল।

চলো তো। একটা মাথা গোঁজার আস্তানা পেলেই হলো। ফ্রান্সিস বলল।

কেরিনিয়া বন্দর-শহরের রাস্তা দিয়ে ওরা চলল। রাত হয়েছে। রাস্তা নির্জন। রাস্তার এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। বাড়িঘর অন্ধকারে ডুবে আছে। সবাই ঘুমুচ্ছে বোধহয়।

প্রায় আধঘন্টার ওপর হাঁটতে হাঁটতে ওরা পারিসির বাড়ির দোরগোড়ায় এল। পারিসি দরজার শেকলটা দরজায় ঠুকতে ঠুকতে ডাকল—মা, মা—। বারকয়েক ডাকার পর সাড়া পাওয়া গেল। বুড়ির ভাঙা গলায় কেউ বলছে—কে রে?

আমি পারিসি—মা দরজা খুলে দাও। পারিসি বলল। ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠের দরজা খুলল। মোমবাতি হাতে একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। পারিসিকে দেখে ফোকলা দাঁতে হাসল। বলল, তুই কী করেছিস? রাজার সৈন্যরা তোর খোঁজে তিন-চার দিন এসেছিল।

ওসব নিয়ে ভেবো না। আমি অন্যায় কিছু করিনি। পারিসি বলল। ফ্রান্সিস পারিসি আর ওর মার কথা গ্রীক ভাষায় বলে কিছুই বুঝছিল না। পারিসি ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। তারপর মাকে বলল—আমার এক বিদেশী বন্ধু এসেছে। আমাদের কিছু খেতে দাও।

এত রাতে, কী দেব। ভালো পিঠে আছে—খাবি? মা বলল।

কেন খাবো না। চলো ভেতরে। খেতে দাও। পারিসি বলল। ফ্রান্সিস আর পারিসি তো আধপেটা খেয়েই পালিয়েছিল। কাজেই যখন একটা মাটির থালায় পারিসির মা পিঠে খেতে দিল তখন দু'জনেই হাপুস হুপুস করে খেয়ে নিল। জলটল খেয়ে এতক্ষণে ওদের স্বস্তি হলো। দু'জনে ভেজা পোশাক পাল্টাল। তারপর ঐ ঘরেই দু'জনে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি—বর্তমান শাসক গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। তুমি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা কর।

মুশকিল হয়েছে যে আমি তো জেরস পাহাড় থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে পেলে কয়েদখানায় পাঠাবে। পারিসি বলল।

ঠিক আছে—ফ্রান্সিস বলল, আমাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি রাজসভায় চলো। তোমাকে যাতে কোনো ঝামেলা পোহাতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি করবো।

আমাদের তো রাজধানী নিকোশিয়ায় যেতে হবে। পারিসি বলল।

তাই চলো। তুমি একটা চাষীদের শপাটানা গাড়ির ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিস বলল।

দেখি। পারিসি এই কথা বলে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে পারিসি ফিরে এল।

বলল—গাড়ি পেয়েছি। কিন্তু এতদূর পথ যেতে অর্ধ স্বর্ণমুদ্রার অর্ধ চাইছে। ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, তোমার জানাশুনো কোনো স্বর্ণকার আছে?

তা আছে। পারিসি বলল।

তাহলে গাড়িতে চড়ে আগে সেখানে চলো। আমার বিয়ের আংটিটা বন্ধক রেখে স্বর্ণমুদ্রার অর্ধ নেব। গাড়িভাড়া দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পারিসির মার হাতে তৈরি আরো পিঠে খেল দু'জনে। বাড়িতে তৈরি এত সুস্বাদু পিঠে ফ্রান্সিস যে কতদিন খায়নি। পিঠে খেতে খেতে ফ্রান্সিসের বারবার মার কথা মনে পড়তে লাগল।

ওরা চমীর গাড়িতে চড়ে চলল। পথে এক স্বর্ণকারের দোকানে ঢুকল ওরা। পারিসির পরিচিত দোকানদার। আংটি বন্ধক রেখে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিল। ফ্রান্সিস বারবার বলল, আমি কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। এর মধ্যে সোনার আংটিটা গালিয়ে ফেলবেন না কিন্তু। দোকানদার মাথা নেড়ে বলল, না—না। অন্তত বছর খানেকের আগে আমরা বন্ধকী জিনিস গলাই না।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়িতে উঠল দু'জনে। গাড়ি চলল রাজধানী নিকোশিয়ার দিকে।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর পারিসি পালিয়ে গেছে বলে হ্যারিদের সবায়ের হাত বেঁধে দেওয়া হলো। হাত-বাঁধা অবস্থাতেই খাওয়া শোওয়া।

সেদিন বিকেলে ডাং ঢং করে কয়েদখানার লোহার দরজা খুলে গেল। ভাইকিংরা একটু আশ্চর্যই হলো। এ সময় তো দরজা খোলা হয় না।

দরজা দিয়ে ঢুকল আল জাহিরি। সঙ্গে এক রোগা লিকলিকে আরবী। বেশ ফর্সা। চিবুকে ছাঁটা দাড়ি। মাথায় লাল ফেজ টুপি পরা। দু'জন পাহারাদারকে আল জাহিরি কী বলল। তারা মারিয়ার কাছে এল। মারিয়ার হাত ধরল। মারিয়া এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। এবার হ্যারিরা বুঝতে পারল মারিয়াকে ক্রীতদাসীর মতো ঐ শুঁটকো লোকটার কাছে বিক্রি করা হবে। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো-। সঙ্গে সঙ্গে সব ভাইকিং বন্ধুরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো—। পাহারাদার দু'জন বেশ ঘাবড়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আল জাহিরি দেখল এসব। তারপর ইঙ্গিতে হ্যারিকে ডাকল। ঐ শুঁটকো লোকটা বোধহয় গ্রীক আর আরবি ভাষা জানে। অন্য ভাষা জানে না। তাই হ্যারিকে ডাকল আল জাহিরি।

হ্যারি এগিয়ে গিয়ে আল জাহিরির সামনে দাঁড়াল। আল জাহিরি বলল, আজ হোক, কাল হোক তোমাদের সবাইকে বিক্রি করা হবে। তবে তোমরা বাধা দিচ্ছো কেন?

হ্যারি বলল, শুধু রাজকুমারীকে আমরা বিক্রি করতে দেব না। আমাদের সবাইকে যেদিন বিক্রি করবেন সেইদিন রাজকুমারীকে বিক্রি করতে পারবেন। তার আগে নয়। আল জাহিরি হেসে বলল, ভালো দামে বিক্রি হতো।

সে তো আপনার কেঠো হাসি দেখেই বুঝতে পারছি। হ্যারি বলল।

আল জাহিরি ব্যবসাদার। বুঝল—এত তাড়াহুড়ো করতে গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে। ওর দরকার হ্যারিদের আর মারিয়াকে বিক্রি করা। সময় সুযোগ মতো সেটা করতে হবে। দু'চারজনকে অন্য কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই অজুহাত দেখিয়ে দফায় দফায় নিয়ে বিক্রি করতে হবে। ভাইকিংদের সংখ্যাও কমে আসবে। তখন রাজকুমারীকে বিক্রি করা হবে। কারণ তখন বাধা দেওয়ার মতো ভাইকিংরা খুব কম থাকবে। সহজেই সব মিটে যাবে।

সেই শুঁটকো মতো লোকটাকে কী বোঝাতে বোঝাতে আল জাহিরি চলে গেল।

সেদিন একটু বেলায় কয়েদঘরের দরজা ঢং ডাং শব্দে খুলে গেল। সৈন্যরা কয়েদঘরে ঢুকতে লাগল। সকলের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল। মারিয়াও বাদ গেল না। তারপর আট-দশজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে ওপরে ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। পাহারাদাররা হ্যারিকে বলল, সবাইকে বলো—ডেক-এ উঠতে হবে। হ্যারি গলা চড়িয়ে সেই কথাই সবাইকে বলল। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা একে একে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

প্রায় অন্ধকার কয়েদঘর থেকে বাইরের আলোয় আসতেই সবাই কিছুক্ষণ তাকাতেই পারল না। এই অভিজ্ঞতা ফ্রান্সিস আর বন্ধুদের আছে, কিন্তু মারিয়ার এই অভিজ্ঞতা নেই। মারিয়া বলে উঠল, আমি যে তাকাতেই পারছি না।

হ্যারি বলল, রাজকুমারী—কিছুক্ষণের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই তাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের আলোর তীব্রতা মারিয়ার চোখে সয়ে গেল। ক্যারাভেল থেকে কাঠের পাটাতন ফেলা হয়েছে। পাটাতন দিয়ে হেঁটে হেঁটে সবাই নেমে এল। সৈন্যদল ওদের ঘিরে নিয়ে চলল। যেখানে হ্যারিদের নামানো হলো সেখান থেকে কেরিনিয়া বন্দর বেশ দূরে।

কেরিনিয়া বন্দরে তখন ব্যস্ততা। বেশ কয়েকটি নানা দেশের জাহাজ ভেড়ানো আছে। দু'একটা জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হ্যারিরা যেখানে নামল সেখানটায় দেখল দু'তিনটে লম্বাটে ঘর। ঘরগুলোর মাথায় শুকনো ঘাস আর পাতার ছাউনি। কাস্ত্রী আরবী গ্রীক পাহারাদার সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা সবাই ঐ তিনটি কয়েদঘরের পাহারাদার।

ভাইকিংদের নিয়ে আসা হলো মাঝখানের ঘরটার সামনে। লোহার গরাদ লাগানো দরজা। দু'জন পাহারাদার তালা খুলে ঢং ডাং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ওদের সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। শব্দ তুলে দরজা বন্ধ করা হলো।

এই পাথরগাঁথা কয়েদঘরে ওপরের দিকে গরাদ দেওয়া দু'টো জানালা। এই দিনের বেলাও মশাল জ্বলছে। মেঝেয় শুকনো ঘাস লতাপাতা দড়ি দিয়ে বেঁধে শক্ত করা বিছানা মতো।

ভাইকিংরা কেউ বসল, কেউ শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ পায়চারি করতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর পারিসি গাড়িতে চড়ে এক সন্ধ্যায় নিকোশিয়ায় পৌঁছল। রাজধানী নিকোশিয়া বেশ বড় শহর। গরীব লোকজন আছে, তেমনি ঝলমলে পোশাক পরা অভিজাত ধনীশ্রেণীর মানুষরাও আছে। নতুন শহর। সাজানোগুছোনো সুন্দর শহর। কত লোক। কিন্তু ফ্রান্সিসের সেসব দিকে চোখ নেই। পারিসি বলল, রাজধানী শহর—আপনি তো আগে দেখেননি। চলুন ঘুরে ঘুরে দেখবেন। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল, বন্ধুরা, মারিয়া—সবাই ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি হবে। আমার এখন এক চিন্তা কী করে সবাইকে মুক্ত করবো। অন্য কোনোদিকে তাকাবার অবকাশ নেই আমার। এবার পারিসি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলো। কোনো কথা বলল না।

সেই রাতটা ওরা একটা সরাইখানায় কাটালো।

সকালে ফ্রান্সিস বলল, গী দ্য লুসিগনানের বিচারসভা কখন বসে?

একটু বেলায়। পারিসি বলল।

তাহলে সকালের খাবার খেয়ে চলো বিচারসভায় যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

একটু বেলায় রাজার বিচারসভায় দু'জনে পৌঁছল। তখন বিচারের কাজ চলছিল। কাঠের জমকালো সিংহাসনের সবুজ কাপড়ে মোড়া আসনে গী দ্য লুসিগনান বসে ছিল। একটা বিচারের কী রায় দিল লুসিগনান। বাচ্চাকোলে এক মা হাসতে হাসতে চলে গেল। পেছনে পেছনে গেল তার স্বামীই বোধহয়।

সেনাপতি খুবই ধূর্ত। পারিসি তার নজরে পড়ল। সেনাপতি আসন থেকে উঠে লুসিগনানকে কী বলল। তারপর আঙুল তুলে পারিসিকে দেখিয়ে দ্বাররক্ষীদের হুকুম দিল পারিসিকে বন্দী করার জন্য। দ্বাররক্ষীরা ছুটে এসে পারিসিকে ধরতে গেল। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে ওদের থামতে বলল। দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল, তুমি লুসিগনানকে বুঝিয়ে বলো যে আমি ভাইকিং, বিদেশী, বিশেষ একটা প্রয়োজনে রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাকে যা বলার রাজা লুসিগনান যেন স্পেনীয় ভাষায় বলে। আমি গ্রীক ভাষা জানি না। এবার পারিসি ফ্রান্সিসের শেখানো কথাগুলো পর পর বলে গেল। সব শুনে গী দ্য লুসিগনান ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, তুমি এই সাইপ্রাস দ্বীপে এসেছো কেন?

সে অনেক কথা। শুধু এইটুকু বলি আল জাহিরি আমাদের জাহাজ দখল করে এখানে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। আমাদের সকলকে সে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করবে বলে এনেছে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ, কেরিনিয়া বন্দরের কাছে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসে। যারা কেনাবেচা করে সেই ব্যবসায়ীরা আমার অনুমতির জন্য আমাদের প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা দেয়। তুমি একা কী করে এলে? লুসিগনান বলল।

পালিয়ে এসেছি। আমার একটা আর্জি আপনাকে জানাতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

কী আর্জি? লুসিগনান বলল।

পারিসির কাছে দেবতুল্য একজন মানুষ নিওফিতসের কথা শুনেছি। নিওফিতস খ্রীস্টান সমাজ পরিচালনার রীতি পদ্ধতি যে গ্রন্থটিতে লিখে রেখেছিলেন, সেই গ্রন্থ পারিসি আপনাদের দিয়েছে।

হ্যাঁ দিয়েছে। কিন্তু সেই গ্রন্থে যীশুর একটি মূর্তি আঁকা আছে। লুসিগনান বলল।

ফ্রান্সিস বলল, আপনাদের বিশ্বাস নিওফিতস ঐ রকম একটি কাঠের মূর্তি নিজের হাতে কাঠ কুঁদে কুঁদে তৈরি করেছিলেন। পারিসি সেটা কোনোদিন দেখেনি।

লুসিগনান বলে উঠল—পারিসি মিথ্যেবাদী।

না, না, পারিসি জানে না কোথায় আছে সেই কাঠের মূর্তি। ফ্রান্সিস বলল, ভেবে দেখুন মান্যবর রাজা—পারিসি নিওফিতসের গ্রন্থটা নিয়েও পালাতে পারতো কিন্তু সে তা করেনি। আপনাকে দিয়েছে। মূর্তি পেলে নিশ্চয়ই দিয়ে দিতো। মূর্তি চুরি করে কী লাভ ওর? তা ছাড়া মূর্তি বিক্রি করতে গেলেও ধরা পড়তো।

রাজা গী দ্য লুসিগনান মাথা নেড়ে বলল, না—না— ওকে আমি আবার জেরস পাহাড়ে পাঠাবো।

বেশ। এবার আমার আর্জিটা জানাই মান্যবর রাজা—পারিসির সঙ্গে আমিও জেরস পাহাড়ের চূড়ার কাছে সেই গুহায় মূর্তি খুঁজতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

লুসিগনান বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলল—তুমি পারবে ঐ কাঠের মূর্তি উদ্ধার করতে?

সেটা আমি গুহা পাহাড় এসব দেখে-টেখে বলতে পারবো। এজন্যে আপনার অনুমতি চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ তো তুমিও যাও। লুসিগনান বলল।

মাননীয় রাজা, আমার বিনীত অনুরোধ—যদি আমি সেই মূর্তিটা উদ্ধার করতে পারি তাহলে আল জাহিরির হাতে বন্দী আমাদের দেশের রাজকন্যা ও বন্ধুদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। পারিসিকেও কোনো শাস্তি দেবেন না।

ঠিক আছে—আগে তো মূর্তিটা উদ্ধার করো। রাজা বলল।

সেক্ষেত্রে আমার শর্তটা কিন্তু মানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে—দেরি না করে কাজে লেগে পড়ো। রাজা লুসিগনান বলল।

আমরা আজকেই জেরস পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু তোমাদের পাহারা দেবার জন্যে চারজন রক্ষী যাবে। যদি তোমরা কাঠের মূর্তি নিয়ে পালিয়ে যাও। রাজা বলল।

মানাবর রাজা, আমার স্ত্রী ও বন্ধুরা এখনও আল আহিরির হাতে বন্দীজীবন কাটাচ্ছে—ওদের ফেলে রেখে আমি পালাতে পারি? ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। রাজা গী দা লুসিগনান পাশের আসনে বসা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ করল। তারপর বলল, ঠিক আছে—অনুমতি দিলাম। কিন্তু মূর্তি উদ্ধার করে মূর্তি নিয়ে পালালে তোমাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

সেরকম কিছু ঘটলে যে কোনো শাস্তি মেনে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল, মাননীয় রাজা, সাধু নিওফিতসের গ্রন্থটা একবার দেখতে পারি?

গ্রন্থটি আমার গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। যদি দেখতে চাও তবে গ্রন্থাগারে যেতে হবে। লুসিগনান বলল।

আপনি অনুমতি দিলে এখুনি যেতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ যাও। কথাটা বলে লুসিগনান একজন দ্বাররক্ষীকে ইঙ্গিতে ডাকল। মৃদুস্বরে রক্ষীকে কী নির্দেশ দিল। রক্ষীটি ফ্রান্সিসদের আসতে বলে রাজসভাঘরের বাইরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস আর পারিসিও চলল।

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন একটা পাথরের ঘরের সামনে এসে রক্ষীটা দাঁড়াল। কাঠের বিরাট দরজা বন্ধ। রক্ষীটা পেতলের কড়া কাঠের দরজায় ঠুকে শব্দ করল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। এক টাকমাথা বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। পরনে দামী কাপড়ের আলখাল্লা মতো। বোঝা গেল ইনিই রাজার গ্রন্থাগারটির দেখাশুনো করেন। রক্ষীর সঙ্গে কথা শেষ করে তিনি হেসে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ভেতরে আসতে বললেন।

ফ্রান্সিসরা দরজা পেরিয়ে ঢুকল। এই দিনের বেলায়ও ঘরটা বেশ অন্ধকার। কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। এবার গ্রন্থাগারিক গ্রীকভাষায় কিছু বললেন। ফ্রান্সিস বুঝল না। তখন উনি পরিষ্কার স্পেনীয় ভাষায় বললেন, আপনি কি শুধু সাধু নিওফিতসের গ্রন্থটিই দেখবেন?

হ্যাঁ—ফ্রান্সিস বলল, গ্রীকভাষায় লেখা। আমি কিছুই বুঝবো না। শুধু গ্রন্থটির প্রথম পাতায় যীশুখ্রিস্টের যে ছবিটা আছে সেটা দেখবো।

শুধু ছবিটা দেখবেন? এই কথা বলে গ্রন্থাগারিক একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে চললেন।

হ্যাঁ, রাজা গী দা লুসিগনানের বিশ্বাস সাধু নিওফিতস ঐ ছবির মতো একটি কাঠের মূর্তিও তৈরি করেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

অসম্ভব নয়—ছবিটা এত জীবন্ত যে অবাক হতে হয়, গ্রন্থাগারিক বললেন। কাঠের পাটাতনে রাখা আশেপাশের বড় বড় গ্রন্থগুলির পরে কোনার দিকের এক কাঠের পাটাতনের সামনে এসে গ্রন্থাগারিক বললেন, সাধু নিওফিতসের লেখা এই গ্রন্থটি।

ফ্রান্সিস মোটা চামড়া-বাঁধাই হাতে লেখা মোটা গ্রন্থটির মলাট ওল্টালো। দেখল—যীশুর ছবি আঁকা। সত্যিই ছবিটি জীবন্ত মনে হচ্ছে। পাতা উল্টে দেখল গ্রীক ভাষায় লেখা। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞেস করল, গ্রন্থটি কী বিষয় নিয়ে লেখা?

খ্রীস্টীয় ধর্মমণ্ডলী কীভাবে পরিচালিত হবে তার নির্দেশ। সাধু নিওফিতস বেশ কয়েক বছর ধরে গুহার নির্জনতায় আশ্রয় নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থাগারিক বললেন।

কিন্তু লেখা শেষ করে যেতে পারেননি। পারিসি বলল।

হ্যাঁ, শেষ নেই। হয়তো আরো কিছু তাঁর লেখার ইচ্ছে ছিল। গ্রন্থাগারিক বললেন।

ফ্রান্সিস গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয় সাধু নিওফিতস ঠিক এই ছবির মতো একটি কাঠের যীশুমূর্তি বানিয়েছিলেন?

তা বলতে পারবো না। তবে রাজা গী দা লুসিগনান বিশ্বাস করেন সাধু নিওফিতস একটা এই ছবির মতো মূর্তি গড়েছিলেন। গ্রন্থাগারিক বললেন।

কোন ঘটনার জন্যে তাঁর এই বিশ্বাস হয়েছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

গ্রন্থাগারিক তখন গ্রন্থের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, যীশুর স্নানের জল পবিত্র—এই কথা দিয়েই পুস্তকটি শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো পুস্তকের আঁকা যীশুকে তো স্নান করানো সম্ভব নয়। তাই সাধু নিওফিতস এমনি একটা মূর্তি গড়েছিলেন, হয়তো সেই মূর্তিটিকেই স্নান করাতেন। যে জলটুকু দিয়ে মূর্তিটিকে স্নান করাতেন সেই জলটুকু নিশ্চয়ই পবিত্র জল। তাই আমরা বিশ্বাস করি এমনি একটি মূর্তি নিশ্চয়ই সাধু নিওফিতস তৈরি করেছিলেন এবং সেটা সেই গুহাতে বা তার আশেপাশে কোথাও আছে।

ফ্রান্সিস পারিসিকে দেখিয়ে বলল, এর নাম পারিসি। সাধু নিওফিতসের শেষ সময় পারিসি বেশ কিছুকাল তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিল। কিন্তু পারিসিকেও তিনি কোনোদিন কোনো মূর্তির কথা বলেননি।

গ্রন্থাগারিক বললেন, এই পারিসির কথা আমরা জানি। পারিসিই এই গ্রন্থটি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল।

ফ্রান্সিস বলল, তাই আমরা মূর্তিটা খুঁজে বের করতে জেরস পাহাড়ে যাচ্ছি।

খুব ভালো কথা। সাধু নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি মূর্তি তো আমাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। যীশুর কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সফল হোন।

ফ্রান্সিস আর পারিসি গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে এল।

এবার কাজে নামা। বাইরে এসে যে চাষী গাড়ি চালিয়ে ওদের নিয়ে এসেছিল সেই গাড়ি চড়ে বাজারে এসে এক সরাইখানায় খেয়ে নিল। এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনল। পশমী পোশাক বেশি কিনল। পারিসি বারবারই ঐ গুহার এলাকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কথা বলছিল। খাবার-দাবারও কিনল—সব গুছিয়ে দু'জনে দুই

বোঁচকামতো বাঁধল। গাড়িতে রাখল।

গাড়োয়ান চাষীটিকে ফ্রান্সিস পুরো একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল। বলল, জেরস পাহাড়ের নিচে আমাদের পৌঁছে দাও। চাষী স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে খুব খুশি। ফ্রান্সিস আর পারিসি গাড়িতে উঠল। গাড়োয়ান চাষী গাড়ি চালাল জেরস পাহাড়ের উদ্দেশে।

জেরস পাহাড়ের নিচে যখন পৌঁছল তখন বিকেল। ফ্রান্সিস আর পারিসি মালপত্র নামিয়ে নিল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

দু'জনে বোঁচকা কাঁধে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য অস্ত গেল। ওরা একটা পাহাড়ি মানুষদের বস্তিতে পৌঁছল। বস্তির মানুষেরা ওদের দেখে খুশিই হলো। পারিসিকে এর আগে অনেকেই দেখেছে। জানে যে নিওফিতসের জীবনের শেষ সময় পারিসি সেই মহাপুরুষকে সেবা-শুশ্রূষা করেছে।

সেই রাতটা ওরা বস্তিতেই কাটালো।

পরদিন সকালে আবার বোঁচকা কাঁধে পাহাড়ে উঠতে লাগল। দুপুরে একটা চেস্টনাট গাছের নিচে বসে দু'জনে বোঁচকা থেকে শুকনো খাবার বের করে খেয়ে নিল। তারপর আবার উঠতে লাগল।

গত দু'দিন একটু রাস্তামতো পেয়েছে। বিকেল নাগাদ দেখল রাস্তা বলে আর কিছু নেই। পাথরের চাঙ-এর ওপর পা রেখে রেখে ওঠা। শুরু হলো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। দু'জনেই মাথাঢাকা পশমের পোশাক পরে নিল।

সন্ধ্যে নাগাদ একটা ছোট্ট পাহাড়ি মানুষদের বস্তি পেল।

সেই বস্তিতেই খেয়েদেয়ে রাত কাটাল।

পরদিন সকাল থেকেই যাত্রা শুরু করল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার বেগ বাড়লো। গা মাথা ভালো করে গরম কাপড়ে জড়িয়ে ওরা উঠতে লাগল।

দুপুর নাগাদ একটা গুহার সামনে এল। পারিসি বলল, মহাপুরুষ নিওফিতস এই গুহাটায় প্রথমে ছিলেন। পরে আরো উঁচুতে এক গুহায় চলে যান।



ওরা গুহাটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস গুহাটা দেখতে দেখতে বলল, আজকে বিশ্রাম নেব এখানে। রাতটা কাটিয়ে কাল আবার ওঠা শুরু করবো।

দুজনে গুহাটার এবড়োখেবড়ো মেঝেয় কাপড় পেতে বসল। খাওয়া-দাওয়া সারল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। অনেক চিন্তা মাথায়। যীশুর মূর্তি আদৌ নিওফিতস তৈরি করেছিলেন কি না। করলে মূর্তিটা কোথায় রেখেছিলেন? আরো চিন্তা—হাতে সময় খুব কম। আল জাহিরি ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। ও তাড়াতাড়ি মারিয়াকে, বন্ধুদের বিক্রি করে দিতে চাইবে। তার আগেই মূর্তি উদ্ধার করতে হবে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার শুরু হলো পাহাড়ে ওঠা। এখানে গাছ-গাছালি নেই বললেই হয়। শুধু বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। সেসবে কখনো উঠে কখনো নেমে একফালি জায়গা দিয়ে ওঠা। ঠাণ্ডার তীব্রতা বাড়তে লাগল। কখনো কুয়াশা মেঘের মতো চারদিক ঢেকে ফেলছে। এক হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। পরক্ষণেই তীব্র হিমেল বাতাস ও কুয়াশা উড়িয়ে দিচ্ছে। রোদ দেখা যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই কুয়াশা ঢেকে ফেলছে চারদিক। কুয়াশা আর রোদের খেলা চলছে।

দুপুরে থামল একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের নিচে। খাবার বের করে খেয়ে নিল।

আবার পাহাড়ে ওঠা। বিকেলের কিছু আগে একটা বেশ বড় সমতলভূমি দেখল। কয়েকঘর পাহাড়ি লোকের বাস এখানে। ঐ সমতলভূমিতে গম ভুট্টার চাষ করে।

সমতলটুকু পেরিয়ে আসতেই দেখল উঁচুতে একটা পাহাড়ি গুহা। এই গুহার মুখটা বড়। খাড়া চড়াইয়ের মাথায় সেই গুহা।

গুহাটা দেখিয়ে পারিসি বলল, এই গুহাটাতেই সাধু নিওফিতসের সঙ্গে আমি শেষ পর্যন্ত ছিলাম। ফ্রান্সিস গুহাটা দেখতে দেখতে বলল, কিন্তু গুহাটায় উঠলে কী করে?

সেই দড়ি-মইয়ের কথা বলেছিলাম। পারিসি বলল।

কিন্তু সেটা কি আছে এখনও? ফ্রান্সিস বলল।

দেখা যাক। পারিসি বলল।

এমন সময়ে সেই বস্তি থেকে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। পারিসির কাছে এসে পারিসিকে দেখে হাসল। বোঝা গেল পারিসিকে চিনেছে। বৃদ্ধের মুখে বলিরেখা ফুটে উঠল। বৃদ্ধের সঙ্গে পারিসির কিছু কথা হলো। ফ্রান্সিস তার কিছুই বুঝল না। বৃদ্ধটি চলে গেল।

পারিসি ফ্রান্সিসকে নিয়ে খাড়া পাহাড়টার নিচে এল। দেখল দুটো দড়ি ঝুলছে। দড়ির মধ্যেকার কাঠের সিঁড়িগুলো খসে গেছে। দু'টো টানা দড়িই ভরসা।

দু'টো দড়ি ধরেই ওঠা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

আজকে উঠবেন? পারিসি জিজ্ঞেস করল।

না, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কালকে সকালে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হলো। পাহাড়ি বস্তির সেই বৃদ্ধটি এল। পারিসিকে হেসে কী বলল। পারিসি বলল, ফ্রান্সিস, আজ রাতে এরা অতিথি হতে বলছে।

ভালোই তো, ফ্রান্সিস বলল, তুমি

বৃদ্ধকে বলো আমরা আনন্দের সঙ্গে অতিথি হবো। তবে শুধু খাবো, থাকবো না। পারিসি কথাগুলো বৃদ্ধকে বলল। বৃদ্ধ খুব খুশি।

ফ্রান্সিস আর পারিসি বোঁচকা রেখে খেতে গেল। এক বৃদ্ধা ওদের সমাদরে একফালি ঘরে বসাল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ছেলে-মেয়েরাও ফ্রান্সিসদের পেয়ে খুব খুশি। পাহাড়ি জীবনে বাইরের মানুষের সঙ্গে তো ওদের খুব কমই দেখাসাক্ষাৎ হয়। ঐ একফালি ঘরেই ওদের বসিয়ে খাওয়াল—বাড়িতে তৈরি গোল রুটি আর পাখির মাংস। ফ্রান্সিস তো পেট পুরে খেল। এ কদিন তো ভালো খাবার কপালে জোটেনি। পারিসিও পেট ভরে খেল।

বৃদ্ধটি বারবার ঐ একফালি ঘরেই ওদের থাকতে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল এই ঠাণ্ডায় বৃদ্ধের পরিবারের লোকদের কষ্ট হবে। ওরা পাহাড়ি পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল। পশুলোমের কম্বলমতো পেতে গরম পোশাক গায়ে দিয়েই ওরা শুয়ে পড়ল। শেষরাতের দিকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জায়গায় শীতার্ত হাওয়া যেন গায়ে কামড় বসাচ্ছে। ফ্রান্সিস আর ঘুমলো না। আকাশে চাঁদের আলো উজ্জ্বল। তবে মাঝে মাঝে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে উঁচু পাহাড়ের চুড়ো আর তিনদিকের শূন্যতায় কুয়াশার ফাঁকে চাঁদের আলো। সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে পড়ে গেল মারিয়া আর বন্ধুদের কথা। কী কষ্টে ওদের দিন কাটছে। কুয়াশায় চাঁদের আলোর খেলা, পাহাড়ি সৌন্দর্য সবই ফ্রান্সিসের কাছে ম্লান হয়ে গেল। ও চোখ বুঁজে ঝিমোতে লাগল।

সকাল হতেই ফ্রান্সিসরা কাজে নামল। বোঁচকা পিঠে ফ্রান্সিসই প্রথম দড়ি দুটোর কাছে এল। ফ্রান্সিস দড়ি দুটো গায়ের জোরে টানল। যাক—দড়ি দুটো আলগা হয়নি। ওপরে কোনো পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে বাঁধা আছে বোধহয়।

প্রথমে ফ্রান্সিস একটা দড়ি ধরে দড়িটার দু'দিকে পাহাড়ের গায়ে পা রেখে রেখে গুহার মুখের কাছে উঠে এল। এবার পারিসি উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস দড়ি টেনে টেনে পারিসিকে উঠতে সাহায্য করল। পারিসিও গুহার মুখে উঠে এল। দু'জনেই হাঁপাচ্ছে তখন।

এবার দু'জনে গুহায় ঢুকল। বাইরের আলো থেকে এসে অন্ধকারই লাগল গুহার ভেতরটা। আস্তে আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল গুহাটা বেশ বড়। বাইরের তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া গুহার ভেতরে অল্পই ঢুকছে। সেইজন্যেই গুহার ভেতরটায় একটু গরমভাব।

পারিসি গুহাটার বেশ ভেতরে এল। দেখা গেল অনেকটা জায়গায় শুকনো পাতা বিছানো। জায়গাটা দেখিয়ে পারিসি বলল, এইখানে সাধু নিওফিতস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময়ও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। ধর্মতত্ত্বের কথা সেসব। আমার কি সেসব বোঝার মতো বিদ্যেবুদ্ধি আছে নাকি। তবু শুনতাম। বুঝতাম তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাগুলো বলে আনন্দ পাচ্ছেন। পারিসি থামল। তারপর গুহার কোনার দিকে পোড়া হাঁড়ি-কুড়ি দেখিয়ে বলল, সেদিন সন্ধ্যের সময়ই সাধু নিওফিতস খেয়ে নিলেন। আমিই রান্নাবান্না করতাম। সব দিন নয়। পাহাড়ি বস্তির লোকেরা সেই দড়ির সিঁড়ির কাছে রান্নাকরা খাবার রেখে যেত। যেদিন ওসব খাবার পেতাম না সেদিন রান্না করতাম। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল, একটু রাতে সাধু নিওফিতস মৃদুস্বরে আমাকে ডাকলেন—পারিসি—পারিসি। আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম উনি বলছেন—পারিসি, তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো। এবার আমার যাবার সময় হয়েছে। দেখছো না স্বর্গের দেবদূতেরা এসেছে। আমি যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। দেখি—গুহাটা এক অপার্থিব আলোয় ভরে গেছে। আমি সেই আলোর বর্ণনা করতে পারবো না। আমি দ্রুত এসে সাধু নিওফিতসের পায়ে হাত দিলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা। গায়ে হাত দিলাম—ঠাণ্ডা। মুখের কাছে কান পাতলাম। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ নেই। বুকে কান পাতলাম কোনো শব্দ নেই। আমি কেঁদে উঠলাম। সারারাত সাধু নিওফিতসের পা ধরে কাঁদলাম। একটু থেমে পারিসি বলল, সকাল হতে আমি গ্রন্থটা হাতে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে নিচে নামলাম। একটু বেলায় পাফোসের খ্রীস্টিয় মঠের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম। গ্রন্থ দিলাম। সব বললাম। তাঁরাই সাধু নিওফিতসের শেষ কাজ করলেন। পারিসি থামল। তারপর কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে মেঝের পাতা-ছড়ানো জায়গাটায় চুম্বন করল। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

এবার ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে গুহাটা দেখতে লাগল। গুহাটার একেবারে পেছনে একটা বড় ফাটল মতো আছে। তারপরেই একটা ঝর্ণার জল নিচে নেমে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল এই ঝর্ণার জলই নিওফিতস খেতেন। এই ঝর্ণার জলেই স্নান করতেন।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে বোঁচকা খুলল। শুকনো পাতা-ছাওয়া জায়গাটায় একটা মোটা কম্বলমতো পাতল। তারপর শুয়ে পড়ল। পারিসিও বোঁচকা খুলে মোটা কাপড় পেতে বসল। ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, এখানে মানে গুহাটার বাইরে সব জায়গাটাই তুমি দেখেছো?

হ্যাঁ। পারিসি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

কী আছে বাইরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

পাহাড়-টাহাড় যেমন হয়। এখানে ছোট ছোট কয়েকটা সীডার, চেস্টনাট গাছ আছে। পারিসি বলল।

তাহলে সাধু নিওফিতস কাঠ পেয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ, শীতের সময় আগুন জ্বালাবার জন্যে জ্বালানি কাঠও এই গুহার কোনায় জড়ো করা থাকতো। পারিসি বলল।

হুঁ—খাওয়াদাওয়ার পর এই গুহা আর চারপাশ ভালো করে দেখতে হবে।

ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরবেলা খোলা বোঁচকা থেকে আটা, আলু এসব বের করে পারিসি রান্না চাপিয়ে দিল।

খাওয়াদাওয়া সেরে ফ্রান্সিস গুহাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, জ্বলন্ত মশাল হাতে। গুহাটার কঠিন পাথুরে গা। দেখবার কিছুই নেই।

একসময় ফ্রান্সিস কাঠ রাখবার জায়গাটায় এল। কাঠ, শুকনো ডালপালা সরিয়ে সরিয়ে দেখছে, তখনই হঠাৎ নজরে পড়ল একটা হাতুড়ি। ছোট হাতুড়ি। ঐ জায়গায় ডালপাতা সরাতেই দেখল দুটো লোহার ছেনি। একটা বড় একটা ছোট। ফ্রান্সিস উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ডাকল, পারিসি। পারিসি ওর কাছে এল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে হাতুড়ি আর ছেনি দুটো তুলে নিয়েছে। পারিসি কাছে এলে বলল, এসব কী বুঝতে পারছো। পারিসি মাথা নেড়ে বলল, নাঃ। ফ্রান্সিস বলল—সাধু নিওফিতস এই হাতুড়ি ছেনি দিয়েই কাঠ কুঁদে কুঁদে প্রভু যীশুর মূর্তি গড়েছিলেন। কাজেই আমার অনুমান ঠিক। এখানেই কোথাও আছে সেই কাঠের মূর্তি।

হাতুড়ি ছেনি রেখে ফ্রান্সিস গুহার চারদিকটা মশালের আলোয় ভালো করে দেখতে লাগল। আর কিছু পেল না। তবে নিশ্চিত হলো যে কাঠের মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল।

ফ্রান্সিস মশালটা গুহায় রেখে গুহার শেষ ছোট মুখটা দিয়ে বাইরে এল। দেখল সেই ঝর্ণাটা। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল নিওফিতসের লেখা সেই গ্রন্থ শুরু হয়েছে যীশুর স্নানের জল পবিত্র—এই কথাটা দিয়ে। তার মানে জলের কথা বলা হয়েছে। কাজেই এই ঝর্ণার জলের গুরুত্ব বেড়ে গেল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস গুহার পেছনের ফাটলটা দিয়ে বাইরে এল। ঝর্ণাটার জল একনাগাড়ে শব্দ তুলে বয়ে চলেছে। ফ্রান্সিস ঝর্ণাটার পাশ দিয়ে ছোট ছোট ঝোপ, পাথরের বড় বড় টুকরোর ওপর পা রেখে রেখে উঠতে লাগল। কিছুদূর যাত্রাই ওঠার পর দেখল ঝর্ণাটা একটা ছোট্ট গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঝোপঝাড় ধরে ধরে ফ্রান্সিস গুহামুখটায় এল। তখনই দেখল ঝর্ণাটা দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটা নেমে গেছে ওদের গুহাটার পেছন দিয়ে আর একটা ধারা নেমে গেছে ডানদিক দিয়ে। ফ্রান্সিস এই নতুন ধারাটার পাশ দিয়ে নামতে নামতে দেখল ঐ জলধারা একটা কুণ্ডের মতো জায়গায় জমছে। কুণ্ডটার নিচে কোনো ফাটলের মধ্যে দিয়ে সেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এইজন্যেই কুণ্ডে বেশি জল জমছে না। কুণ্ডের চারপাশের লম্বা লম্বা ঘাস ঝোপঝাড় কুণ্ডটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে। ঐ ফাঁকটুকু দিয়ে তাকিয়ে ফ্রান্সিসের মনে হলো কুণ্ডের জলে কী যেন ভাসছে। ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল। লম্বা লম্বা ঘাস ঝোপ সরিয়ে দেখল—একটা কাঠের মূর্তি ভাসছে। উল্টোমুখ তাই কিসের মূর্তি বুঝল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে বেশ কষ্ট করে মূর্তিটা তুলে আনল। এ কী? যীশুর মূর্তি। নিওফিতসের গ্রন্থে আঁকা ছবির সঙ্গে হুবহু মিল। তাহলে এই কাঠের মূর্তিটাই নিওফিতস নিজের হাতে গড়েছিলেন। আনন্দে ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে বলে উঠল, পারিসি, এই সেই মূর্তি। ফ্রান্সিস ভক্তিভরে বুকে ক্রুশ আঁকল।

এবার ফ্রান্সিস মূর্তিটা জামার সামনের গলার কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে নিল। দু'হাত তো খোলা রাখতে হবে। নইলে পাথরে ওঠা-নামা করতে পারবে না। ফ্রান্সিস কুণ্ডের এলাকা থেকে আস্তে আস্তে উঠে আগের ঝর্ণাটার মুখে এল। তার ঝর্ণার ধার দিয়ে পাথর ঝোপঝাড় ধরে ধরে নিজেদের গুহার পেছনে এল। ফাটল দিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকল। দেখল, পারিসি বসে আছে। ফ্রান্সিস মূর্তিটা বের করে পারিসির চোখের সামনে ধরল। মূর্তি দেখে পারিসি অবাক হয়ে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বুকে ক্রুশ আঁকল। জলে ভেজা মূর্তির পায়ে চুম্বন করল। ফ্রান্সিস মূর্তিটা ওর বিছানায় রাখল। কয়েকদিনের পাহাড়ে ওঠার প্রচণ্ড পরিশ্রম, কষ্ট—খাওয়াও ভালো জোটেনি, নাওয়াও হয়নি—ক্লান্তিতে ফ্রান্সিস মূর্তির পায়ের কাছে মাথা রেখে শুয়ে রইল। এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেও শুনল পারিসি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল বেশ বেলা হয়েছে। পারিসি ফ্রান্সিসকে ডাকল—খেয়ে নিন। ফ্রান্সিস দেখল পারিসি খাবার নিয়ে বসে আছে। তার মানে ওকে আজ রাঁধতে হয়নি। পাহাড়ি বস্তির লোকেরা সেই দড়ির নিচের সমতল মাটিতে খাবার রেখে গেছে। পারিসি দড়ি বেয়ে নেমে সেই খাবার নিয়ে এসেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, আর এখানে থেকে লাভ নেই। চলো আজকেই নেমে যাবো।

দু'জনে আবার বিছানা কাপড় সব নিয়ে বোঁচকা বাঁধল। পারিসি কোমরের ফেট্টি খুলল। কপালের কাছে যীশুমূর্তি রেখে ফেট্টি দিয়ে বাঁধল। তারপর গুহা থেকে ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে বোঁচকা কাঁধে বেরিয়ে এল।

নামার সময় যে যে পাহাড়ি বস্তিতে ওরা আশ্রয় নিয়েছে সেখানকার সবাই যীশুর মূর্তির পা চুম্বন করেছে। পারিসি সেই মূর্তি কপালের ফেট্টির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

এক সকালে ওরা সমতলভূমিতে নেমে এল। চলল পাফোসের মঠের অধ্যক্ষের উদ্দেশে। মঠেই দু'জনে দেখা করল অধ্যক্ষের সঙ্গে। মূর্তি দেখাল। অধ্যক্ষ তো আনন্দে দিশাহারা। বললেন, পারিসি কী পরম পবিত্র মূর্তি তোমরা এনেছো, তোমরা বোধহয় জানো না। মহান পুরুষ নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি মূর্তি যে খ্রিস্টিয় সমাজে কী অপরিসীম মূল্যবান তা বলে বোঝাতে পারবো না। এখানকার গীর্জাতেই নিওফিতসের হাতে গড়া মূর্তি থাকবে।

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে পারিসি বলল, এঁর নাম ফ্রান্সিস। জাতিতে ভাইকিং। ইনিই

উদ্ধার করেছেন এই মূর্তি। অধ্যক্ষ তখন ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলো তুমি কী পুরস্কার চাও।

ফ্রান্সিস বলল, আমি কোনো পুরস্কার চাই না। আপনি দয়া করে এই মঠের একজন ধর্মযাজককে আমার সঙ্গে যেতে আদেশ দিন।

তা দিচ্ছি, কিন্তু সে তোমার সঙ্গে কোথায় যাবে? অধ্যক্ষ জানতে চাইলেন।

রাজা গী দ্য লুসিগনানের রাজসভায়। রাজা লুসিগনানের সঙ্গে আমার একটা শর্ত ছিল। ধর্মযাজক যেন বলেন আমি মূর্তি উদ্ধার করেছি এবার রাজা তাঁর শর্ত রাখুন।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অধ্যক্ষ ফ্রান্সিস আর পারিসিকে মঠে থাকতে বললেন। পরদিন তাদের রাজধানী নিকোশিয়ায় যাবার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

পরের দিন সকালে মঠের একটি ঘোড়ায় টানা বড় গাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিসরা এক ধর্মযাজককে সঙ্গে নিয়ে রাজা লুসিগনানের রাজসভায় এল। সেই ধর্মযাজককে খুব সমাদরে রাজসভায় বসানো হলো। তিনি ফ্রান্সিসের মূর্তি উদ্ধারের কথা বললেন। তারপর তিনি ফ্রান্সিসকে বললেন, তুমি কোন শর্তের কথা বলেছিলে সেটা বলো। ফ্রান্সিস মাথা একটু নুইয়ে রাজা লুসিগনানকে সম্মান জানিয়ে বলল, মান্যবর রাজা, আপনি কথা দিয়েছিলেন মূর্তি উদ্ধার করতে পারলে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের আল জাহিরির হাত থেকে মুক্ত করে দেবেন।

হ্যাঁ বলেছিলাম। সেই শর্ত আমি নিশ্চয়ই রাখবো। সমস্ত সাইপ্রাসবাসীরা আজ তোমার জন্যে এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হলো। একটু থেমে রাজা বললেন, আমার সেনাপতি নিজে তোমাকে নিয়ে কেরিনিয়া যাবে এবং তোমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে।

রাজসভা থেকে ফ্রান্সিস ও পারিসি বেরিয়ে এল। পারিসি বলল, আমার কাজ



তো শেষ। আমি বাড়ি যাই। আমার বুড়ি মা একা আছে।

ঠিক আছে। তুমি যাও। ফ্রান্সিস বলল। ওর আবার নিজের মার কথা মনে পড়ল। চোখ ভিজে উঠল। চোখ মুছে তাকিয়ে দেখল, সামনেই রাজবাড়ির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে সেনাপতি বসে আছে। সেনাপতি ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসকে গাড়িতে উঠে আসতে বলল। ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে সেনাপতির পাশে বসল।

গাড়ি চলল কেরেনিয়া বন্দর-শহরের উদ্দেশে। সেনাপতি বলল, এই মওকায় সোনাদানা চাইলে রাজা তাই দিতেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল, সোনাদানার ওপর কোনো লোভ নেই আমার। আমার এখন সবচেয়ে প্রয়োজন বন্ধুদের মুক্তি। কথাটা বলে হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ওদের বিয়ের সেই দামি আংটিটা এক স্বর্ণকারের কাছে বন্ধক আছে। ফ্রান্সিস বলল, সেনাপতিমশাই, একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

বলো, কী রকম সাহায্য?

একজন স্বর্ণকারের কাছে অভাবের সময় একটা আংটি বন্ধক রেখেছি। ওটা ছাড়াতে গেলে আমাকে কেরেনিয়া থেকে আবার এখানে আসতে হবে।

আংটিটা ছাড়িয়ে নেবে—এই তো? সেনাপতি বলল।

হ্যাঁ, ফ্রান্সিস বলল।

সেই স্বর্ণকারের দোকানটা কোথায়? সেনাপতি জানতে চাইল।

চলুন দেখাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

দোকানটার সামনে এসে ফ্রান্সিস সেনাপতিকে দোকানটা দেখাল। সেনাপতি গাড়ি থামাতে বলল। তারপর কোচয়ানকে বলল, স্বর্ণকারকে ডেকে নিয়ে আয়। একটু পরেই কোচয়ানের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে স্বর্ণকার এল। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, এর একটা আংটি আপনার কাছে বন্ধক আছে?

হ্যাঁ। স্বর্ণকার ভীত স্বরে বলল।

ঐ আংটিটা নিয়ে আসুন। সেনাপতি বলল। স্বর্ণকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে আংটিটা নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস আংটিটা আঙুলে পরতে পরতে বলল, কিন্তু আমার কাছে তো—

সেনাপতি হাত তুলে ফ্রান্সিসকে থামাল। কোচয়ানকে বলল, গাড়ি চালা। গাড়ি চলল।

গাড়িতে বসে ফ্রান্সিসের সঙ্গে সেনাপতির খুব সামান্য কথাই হলো।

বিকেল নাগাদ সেনাপতি আর ফ্রান্সিসকে নিয়ে গাড়ি কেরেনিয়ার জাহাজঘাটায় পৌঁছল। দু'জনে গাড়ি থেকে নামল। ফ্রান্সিস দেখল আল জাহিরির জাহাজের সঙ্গে ওদের জাহাজটা বাঁধা আছে তখনও। ফ্রান্সিস আল জাহিরির জাহাজটা দেখিয়ে সেনাপতিকে বলল, এটাই আল জাহিরির জাহাজ। সে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের বন্দী করে রেখেছে।

কোথায় বন্দী করে রেখেছে? সেনাপতি বলল।

সেটা আমি বলতে পারবো না। আল জাহিরিকে জিজ্ঞেস করুন। ফ্রান্সিস বলল।

আল জাহিরির জাহাজ থেকে তখন একজন সৈন্য নেমে আসছিল। সেনাপতি তাকে ডেকে বলল, যাও আল জাহিরিকে এখানে আসতে বলো। বলবে যে সাইপ্রাসের সেনাপতি তাকে ডাকছে। পাহারাদারটি মাথা একটু নুইয়ে জাহাজে উঠে গেল। একটু পরেই আল জাহিরি বেশ ব্যস্ত হয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল। মাথা নুইয়ে সেনাপতিকে সম্মান জানিয়ে বলে উঠল, মহামান্য সেনাপতি আমার জাহাজে আসুন।

সময় নেই। সেনাপতি বলল। তারপর ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, এর নাম ফ্রান্সিস। সাধু নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি খ্রীস্টমূর্তি উদ্ধার করেছে। এর স্ত্রী আর বন্ধুদের কোথায় বন্দী করে রেখেছো? সেনাপতি বলল।

আল জাহিরি আঙুল তুলে একটা লম্বাটে ঘর দেখিয়ে বলল, ঐ কয়েদঘরে বন্দী করে রেখেছি।

এক্ষুণি সবাইকে মুক্তি দাও। যাও। সেনাপতি বেশ ধমক দিয়ে বলল।

ততক্ষণে আল জাহিরির কিছু সৈন্যও জাহাজ থেকে নেমে এসেছে। তাদেরই দু'জনকে আল জাহিরি পাঠাল মারিয়া আর হ্যারিদের মুক্তি দেবার জন্যে।

ফ্রান্সিস সেনাপতিকে বলল, আমার কাজ তো আমি শেষ করেছি। এবার আমরা দেশে ফিরবো।

বেশ। সেনাপতি বলল। তারপর গাড়িতে গিয়ে উঠল। সেনাপতিকে নিয়ে গাড়ি চলল রাজধানী নিকোশিয়ার দিকে।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মারিয়া হ্যারিরা বেরিয়ে আসতে লাগল কয়েদঘর থেকে। একজন পাহারাদার ওদের হাতবাঁধা দড়িটা ছোরা দিয়ে কেটে দিতে লাগল। আল জাহিরি বিরস মুখে হ্যারিদের মুক্তি দেখতে লাগল। একটা ভালো দাঁও ফসকে গেল। মারিয়া আর এই স্বাস্থ্যবান ভাইকিংদের বিক্রি করতে পারলে কত স্বর্ণমুদ্রা পেত। উপায় নেই। স্বয়ং সেনাপতির আদেশ। এদের মুক্তি দিতেই হলো।

কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখে সবাই ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো—। এবার আনন্দের ধ্বনি। মারিয়া বলল, ফ্রান্সিস, আমাদের কীভাবে মুক্ত করলে?

সব পরে বলবো। এখন সবাই আমাদের জাহাজে চলো। খাওয়াদাওয়া কর। বিশ্রাম কর।

মারিয়া আর ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে নিয়ে নিজেদের জাহাজে উঠল। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে আল জাহিরির জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা কেটে ফেলল। একদল ভাইকিং দড়ি-দড়া বেঁধে পাল ঠিকঠাক করতে লাগল। পেড্রো নজরদারের জায়গায় উঠে গেল। হাওয়ার বেগ যথেষ্ট। পালগুলো ফুলে উঠল। নোঙর তোলা হয়েছে আগেই। জাহাজ বেগে চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। ফ্লেজার হুইলে হাত রাখল। হিসেব করে জাহাজের মুখ ঘোরাল পশ্চিমদিকে।

রাতের আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুরা, বিস্কো, শাঙ্কো এল। তখন ফ্রান্সিস কী করে খ্রীস্টমূর্তি উদ্ধার করল সেই ঘটনা বলে গেল। বলা শেষ হলে ভাইকিংরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো—।

জাহাজ চলল ফ্রান্সিসদের দেশের উদ্দেশে। জ্যোৎস্নার আলো নাচতে লাগল ঢেউয়ের মাথায় মাথায়।

ছবি : অমিত চক্রবর্তী





অনিল ভৌমিক এর জন্ম হয় ১৯৩২ সালের ব্রিটিশ ভারতের বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। তাঁর বাল্যকাল এবং প্রথম যৌবন কেটেছিল ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর শহরে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গার সময় তিনি দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল অফিসে পেশাগত জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি এই চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহন করেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলে এমএ বিটি। তিনি আকাশবাণীতে বিখ্যাত লেখকদের গল্প উপন্যাসের বেতার নাট্যরূপ লিখেছেন। 'পরাশর রায়' এই ছদ্মনামে তিনি আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত গীতিকার। তিনি একজন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। তিনি মূলত তাঁর সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র ফ্রান্সিস এবং তার বন্ধুদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর জন্য বিখ্যাত।